KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 92/১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
Collection : KLMLGK	Publisher :
Title : গুরুদেব খুড়ু	Size : 7" x 9" 17.78 x 22.86 C.m.
Vol. & Number :	Year of Publication :
	Condition : Brittle Good
Editor : সাময়িক ৭৩	Remarks : NO OF Page's missing

CD Roll No. : KLMLGK

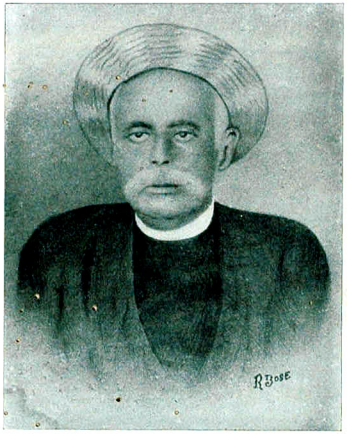

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চন্দ্রশেখর বসু
(রাজশেখর বসু-প্রণীত তাঁহার
পিতৃদেবের প্রতিকৃতি)
[১]

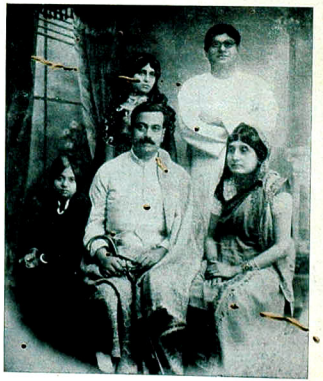

সহধর্মিণী, কন্যা, জামাতা ও শিশু
দৌহিত্রী সহ রাজশেখর
[২]

বনভোজন
(শশিশেখর, গিরীন্দ্রশেখর, যতীন্দ্রকুমার সেন
প্রভৃতির সঙ্গে রাজশেখর)

[৩]

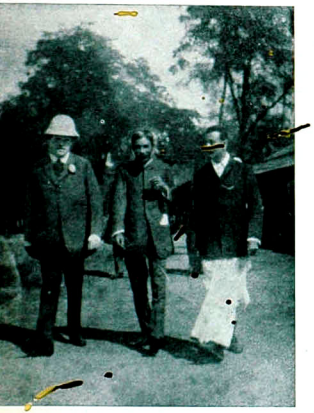

লর্ড কারমাইকেল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও রাজশেখর

[৪]

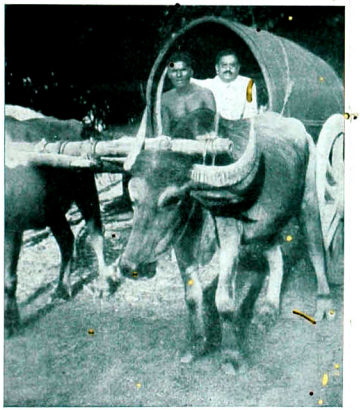

মেঙ্গের গাড়ী চড়ে যাচ্ছেন

[৫]

বকুলবাগানের বাসভবন

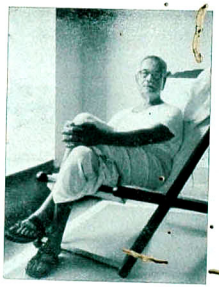

যেমন তাঁকে দেখা যেত
ঝুলবারান্দার ইজিচেয়ারে

'শূন্য আজি—'

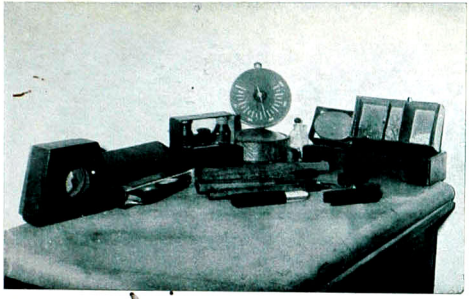

নিজের হাতে তৈরি বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের নানা জিনিস। মধ্যস্থলে হাইগ্রোমিটার যন্ত্রটি দেখা যাইতেছে

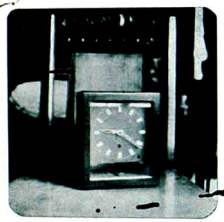

স্বহস্তে প্রস্তুত ঘড়ি
(স্প্রিংটি জার্মানী হইতে আনীত)

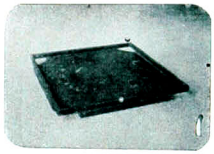

মাতৃহীনা দৌহিত্রীর জন্য স্বহস্তে নির্মিত একখানা ক্যারম বোর্ড। বোর্ডটির ভিতরে তার আঁকা বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি—দীর্ঘদিনে অস্পষ্টপ্রায়

এই আলমারীটির উপরদিকে ল্যাবরেটরী, নিচের দু'তাকে কারখানা

ল্যাবরেটরীর কাজ চলত যেখানে

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

জীবন-কথা

১৮৮০ সালের ১৮ই মার্চ—১২৮৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র বর্ধমান জেলায় ব্রাহ্মণপাড়ায় মাতুলালয়ে রাজশেখর বসু জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার। রাজশেখররা চার ভাই—শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর। ইঁহাদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র কৃষ্ণশেখরই জীবিত আছেন। দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল হইতে রাজশেখর এণ্ট্রান্স এবং পাটনা থেকে ফার্স্ট আর্টস পাস করেন। তারপর বি.এ. এবং এম.এ. (বি কোর্স) পাস করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। কেমিষ্ট্রিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এম.এ. (বি. কোর্স) পাস করেন।

বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার এই অনুরাগই তাঁহার উত্তরজীবনকে বিজ্ঞান-সাধনায় নিয়োজিত করে। কলেজ ছাড়িয়া তাই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অধীনে রাসায়নিক হিসাবে কাজে যোগ দেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। বেঙ্গল কেমিক্যালের আজ যে উন্নতি ও খ্যাতি তাহার পিছনে রাজশেখরের অবদান অসামান্য। আপন কর্মদক্ষতায় তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ১৯৩৪ সালে একমাত্র কন্যা ও জামাতার মৃত্যুর পর রাজশেখর এই কর্মময় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেঙ্গল কেমিক্যালের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যঙ্গ করিয়া তিনি তাঁহার প্রথম রচনা 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ভারতবর্ষে প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার-হোল্ডারদের বিবাদকে কেন্দ্র করিয়াই এই গল্পটি লিখিত।

তাঁহার প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপিপাসু মহলে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের দেখিয়াছেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে। আর সেই দেখারই ফলে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয় একটি অদ্ভুত চরিত্র, সে-চরিত্র হইতেছে গণ্ডেরিরাম-বাটপারিয়া। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড একবার যে পড়িয়াছে সে কখনো এই বাটপারিয়াকে ভুলিতে পারিবে না।

নিয়মিত সাহিত্যসেবা করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ তখন রাজশেখরের ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন তাঁহাকে রেহাই দিলেন না। ক্রমাগত তাগাদা দিয়া তিনি একে একে—চিকিৎসা সঙ্কট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভূশণ্ডীর মাঠে ইত্যাদি গল্প লিখাইলেন। কিন্তু এই সব ছড়ানো গল্পও সংকলিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত না, যদি না শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে অগ্রণী হইতেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজশেখরের প্রথম গ্রন্থ গড্ডলিকা প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় পরশুরাম ছদ্মনামে। এই নামকরণের ইতিবৃত্ত যাহা জানা যায় তাহা হইতেছে এই যে, নিজের নামে লেখা হইতে সংকোচ-বশতঃ রাজশেখর যখন একটি ছদ্মনাম খুঁজিতেছিলেন তখন হঠাৎ বাড়িতে আসিল পরিবারের স্যাকরা—নাম তাহার পরশুরাম। তাহার নামটিই রাজশেখর গ্রহণ করিলেন ছদ্মনাম হিসাবে।

গড্ডলিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসার স্রোত বহিতে থাকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমন প্রশংসা করেন যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রীতিমত শঙ্কিত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে লেখেন……"আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গড্ডলিকার প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন অচিরে পরস্পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়……"

এই চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"…যাই হোক, আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়া দেখিলাম, আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মাদুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।"

রাজশেখর এককালে কবিতাও লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতারও বহুবার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

রাজশেখরের প্রতিভা শুধুমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার সাধনার পরিণতিতে আমরা পাইয়াছি 'চলন্তিকা'—তাঁহারই সংকলিত অভিধান।

বাংলা লাইনোটাইপ প্রবর্তনে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি ৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেনকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯৩২ সালে কর্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণের পর সাত-আট বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান সংস্কার সমিতির সভাপতিত্ব করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী কর্মের পরিভাষা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন।

১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক ও ১৯৪৫ সালে সরোজিনী পদক দিয়া সম্মানিত করেন।

১৯৫৫ সালে রাজশেখর রবীন্দ্রপুরস্কার পান। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রী দেন।

১৯৫৮ সালে আনন্দীবাই গ্রন্থের জন্যে সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার পান।

হিন্দী তামিল তেলেগু আর কানাড়িতে রাজশেখরের রচনা অনূদিত হইয়াছে।

তাঁহার পরলোকগমনের পূর্বেই সাহিত্য একাডেমী তাঁহার নির্বাচিত গল্পের একটি ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

পরিমিত বোধ ও শৃঙ্খলা তাঁহার জীবনের মূল কথা। কোন বিষয়েই অকারণ উচ্ছ্বাস—বেশী কথা বা বেশী হাসিগল্পও তাহার অন্তর্ভুক্ত—তিনি পছন্দ করিতেন না। সংসারের সর্বত্র একটি সংযত শ্রী ও পারিপাট্য বাজায় রাখা কত সহজে সম্ভব তাহা তাঁহার বাড়ির গণ্ডিতে পা দিলেই বুঝা যাইত।

বসিবার ঘর, পড়িবার টেবিল, কাগজ কলম পেন্সিল হইতে শুরু করিয়া ভাঁড়ার মসলার কৌটো অবধি তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। ভাঁড়ারের প্রতিটি শিশি কৌটো বোতলের গায়ে পরিষ্কার হাতের লেখায় লেবেল লাগানো; একটি আলমারির উপরের তাকে তাঁহার লেবরেটরীর জিনিসপত্র, নিচের দুটি তাকে

ক্রু-ডাইভার, ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম প্রভৃতির ছোট্ট একটি কারখানা। দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগিতে পারে এমন কোন জিনিসের অভাব নাই সে কারখানায়।

বাড়িতে যখন যে আসবাবটি আসিয়াছে নিজের ফরমাস অনুযায়ী করাইয়াছেন। আর প্রতিটিরই কোন না কোন স্থানে ছোট্ট একটি লেবেল লাগানো আছে—কবে কখন তাহা কেনা হইয়াছে।

অনেকেই হয়ত জানেন না—রাজশেখর শিল্পচর্চা করিতেন। এ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার পিতার পেন্সিল স্কেচখানি সেই শিল্পচর্চারই নিদর্শন।

বোর্ডের টুকরা দ্বারা বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরনের বাক্স তৈয়ারি করিতেন—তার কোনটি মসলার কৌটো, কোনটি বা পেন্সিলের বাক্স। কাপড় দিয়া ছোট ছোট কলমের খাপ, ছুরির খাপ ইত্যাদি তিনি অনেক সেলাই করিয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্রীর কাছ হইতে জানা যায় যে তিনি একবার প্রায় ৪০ খানি কাঁথা সেলাই করিয়াছিলেন, এই দৌহিত্রীটির জন্মের পূর্বক্ষণে। তাঁহার তৈরি করা একখানা ক্যারামবোর্ডের ছবি এই সংখ্যারই অন্যত্র অন্যান্য জিনিসপত্রের ছবির সঙ্গে ছাপা হইয়াছে।

সংসারের দৈনন্দিন খরচ রাখিবার একটি বিশেষ রীতি ছিল তাঁহার। একেক সিট কাগজে তাঁহার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ছক কাটিয়া তিনি একেক মাসের হিসাব রাখিতেন।

দৈনন্দিন তাপমাত্রা ও বায়ুর আর্দ্রতা মাপা ছিল তাঁহার সখ। বারান্দার কোনায় রাখা ছিল একটি ব্যারোমিটার। পোস্ট বোর্ডের দ্বারা নিজেই তৈয়ারি করিয়াছিলেন একটি হাইগ্রোমিটার যন্ত্র—বাতাসের আর্দ্রতা মাপিবার জন্য। রোজই সকালে খবরের কাগজের রিপোর্টের সঙ্গে নিজের যন্ত্রটা মিলাইয়া দেখিতেন—যন্ত্রটা ঠিক মত কাজ দিতেছে কি না।

স্প্রিং ও অন্যান্য যান্ত্রিক অংশ ক্রয় করিয়া তিনি একটি ঘড়িও তৈয়ারী করিয়াছিলেন। অন্যত্র সে ঘড়িটির প্রতিলিপি ছাপা হইল।

এমনি ধরনের অসংখ্য হাতের কাজের নমুনা তাঁহার গৃহের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। দেশবাসিকে যখন তিনি সাহিত্যের রস পান করাইতেছেন, তিনি তখন রস সংগ্রহ করিতেন. এই সমস্ত হাতের কাজের মধ্যে। সাহিত্যিক ও কারিগর—এই দ্বৈত সত্তাই তাঁহার জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

নিজের সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যিক হতে গেলে কিছু বিদেশী এবং অনেক কিছু দেশী সাহিত্য পড়তে হয়। আমি প্রায় কিছুই পড়িনি। কাজেই আমাকে লেখক বলতে পারেন, সাহিত্যিক কিছুতেই নয়, আমার লেখার প্রশংসা অনেকেই করেন, কিন্তু মনে হয়, তাঁরা আমার লেখা পড়েন খুবই কম।

"তবে শ্রমিকদের মধ্যে আমি খুব মিশেছি। তাঁদের খুবই প্রিয় ছিলাম আমি। অনেকটা এক পরিবারভুক্ত পরিজনের মত। এখন সে অবকাশ নেই, সামর্থ্যও নেই। মিশেছি বেশি কারিগরদের সঙ্গে, স্বভাবটাও আমার হয়েছে সেই রকম খানিকটা। তাঁদের নিয়ে লেখা 'ভূষণ পাল' নামে আমার একটি গল্প 'চমৎকুমারী' গ্রন্থে আছে। ঘটনা কিছুটা সত্য। আর একটি লিখেছিলুম—চাপিনি। আমি অবশ্যই তাঁদের সংসারের খবর কিছুই জানি না। আধুনিককালে যাঁরা জানার সেই সুযোগ পাচ্ছেন, তাঁরা তো চমৎকার লিখছেন।"

বাল্যকাল হইতে রাজশেখর অত্যন্ত নিয়মমাফিক চলিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রতিদিনের কার্যসূচী নির্দিষ্ট ছিল। নিয়মের ব্যতিক্রম—সে নিজের সম্বন্ধে হোক বা পরের সম্বন্ধে হোক তিনি পছন্দ করিতেন না।

সকাল সাড়ে চারিটায় শয্যাত্যাগ করিতেন। উঠিয়া প্রত্যহ নিজেই কফি তৈরী করিতেন। গত কয়েক-মাস যাবত শরীর খুব খারাপ হওয়ায় বন্ধু-নামক তাঁহার প্রিয় পরিচারক কফি তৈরী করিত। কফি পানের পর তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন। ইহার পর তিনি নীচে নামিয়া আসিতেন এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য পড়াশোনায় মগ্ন থাকিতেন।

সাড়ে আটটায় উপরে আসিয়া জলযোগ করিতেন। তাহার পর সাড়ে দশটায় স্নান। মাঝের এই সময়টি তিনি কখনও তাঁহার ইজিচেয়ারটিতে বসিয়া থাকিতেন, কখনও বা টুকিটাকি হাতের কাজ করিতেন, কখনও বা বিভিন্ন সাময়িকপত্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। তারপর উঠিয়া স্নান, স্বল্প বিশ্রাম, ১১টায় মধ্যাহ্ন ভোজন। রাজশেখর আজীবন নিরামিষাশী—কিন্তু তাঁহার পালিত ১৩টি মার্জারের জন্য ছিল আমিষের ব্যবস্থা। মার্জারদের আহারের ব্যবস্থা হইলে তবে তিনি নিজে আহার করিতেন।

আহারের পর বেলা একটা পর্যন্ত উপরে বিশ্রাম করিবার পর রাজশেখর পুনরায় নীচে নামিতেন এবং চারটা পর্যন্ত লেখাপড়া করিতেন। প্রধানতঃ এই সময়ই তিনি লেখার কাজ করিতেন। চারটার সময় উপরে যাইয়া বৈকালিক জলযোগের পর পুনরায় বিশ্রাম, খুঁটিনাটি কাজ, অভ্যাগত কেহ থাকিলে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। অনেক সময় দেখা যাইত ঝুল বারান্দায় নিজের ইজিচেয়ারটিতে বসিয়া চুপ করিয়া চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন। কোন্ চিন্তায় তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই।

রাত্রি নয়টায় নিয়মিত তিনি শয্যাগ্রহণ করিতেন।

জীবনের শেষ দিনটিতেও তাঁহার এই প্রাত্যহিক রুটীনের পরিবর্তন ঘটে নাই। তফাতের মধ্যে এইদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ যাইবার কথা। বেলা আড়াইটায় মিটিং। বেঙ্গল কেমিক্যাল হইতেই গাড়ী আসিবার কথা। তাই দ্বিপ্রাহরিক আহারের পরই দোতলা হইতে একতলায় নামিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেখানেই একটি ঘরে বিশ্রাম লইবার আশায় শয়ন করিয়াছিলেন। শয়ন করিবার পূর্বে অন্যতম পরিচারক সুধীরকে বলেন—'সুধীর, ওসমান এলেই উপর থেকে আমার জুতো নিয়ে আসবে আর চটি জুতো জোড়া উপরে রেখে দেবে।' মৃত্যুর পূর্বে ইহাই সম্ভবতঃ রাজশেখরের মুখের শেষ কথা।

ওসমান গাড়ী লইয়া আসিবার পর সুধীর যথারীতি তাঁহাকে ডাকে। কিন্তু কয়েকবার ডাকিবার পরও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় জাগাইবার চেষ্টায় সে গায়ে হাত দেয়। হাত দিয়াই সে টের পায় যে বাবুর শায়িত দেহ শক্ত। তাড়াতাড়ি সে উপরে গিয়া রাজশেখরের একমাত্র দৌহিত্রী আশা বসুকে খবর দেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দেন। খবর পাইবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার চলিয়া আসেন। তিনি আসিয়াই বুঝিতে পারেন রাজশেখর আর ইহলোকে নাই।

কয়েকবছর হইতেই রাজশেখর রক্তের চাপাধিক্যে ভুগিতেছিলেন। গত কিছুদিন হইতে মাঝে মাঝেই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। চিকিৎসার সাহায্যে সম্প্রতি এই মূর্ছা যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্যু অতর্কিতেই আসিয়া বাঙালীর পরম শ্রদ্ধার এই মানুষটিকে অপহরণ করে।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

॥ গ্রন্থপঞ্জী : সংক্ষিপ্ত ॥

(ক) গল্পসংগ্রহ

১। গড্ডলিকা। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ১২শ সংস্করণ চলিতেছে।

২। কজ্জলী। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ৮ম সংস্করণ চলিতেছে।

৩। হনুমানের স্বপ্ন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ৫ম সংস্করণ চলিতেছে।

৪। গল্পকল্প। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে।

৫। ধুস্তরীমায়া। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে।

৬। কৃষ্ণকলি। ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

৭। নীলতারা। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৮। আনন্দীবাঈ। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

৯। চমৎকুমারী। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

(খ) শব্দকোষ

১৭। চলন্তিকা। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ৮ম সংস্করণ চলিতেছে।

(গ) সংস্কৃত হইতে অনুদিত:

১০। কালিদাসের মেঘদূত। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

১১। রামায়ণ। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ৪র্থ সংস্করণ চলিতেছে।

১২। মহাভারত। ১৩৫৬।
বর্তমানে ৩য় সংস্করণ চলিতেছে।

২৩। হিতোপদেশের গল্প। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

(ঘ) প্রবন্ধ

১৪। লঘুগুরু। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১৫। বিচিন্তা। ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১৬। কলচিন্তা। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।
বর্তমানে ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

(ঙ) বিবিধ

১৮। কুটির শিল্প। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

১৯। ভারতের খনিজ। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

সনৎকুমার গুপ্ত সংকলিত

হরীতকীর কালি

(১) হরীতকী, বীজ বাদ, কোটা গুঁড়া ৪১ গ্রাম
তাল পাঁচ আউন্স
দশ দিন ভিজবে। খুব ছাঁকা পড়বে।
তার পর ন্যাকড়ায় ছেঁকে নাও।
ছিবড়েতে আরও জল দিয়ে নিংড়ে
নাও। মোট স্কাম হবে —৯ আউন্স

(২) ফেরাস সালফেট ১২.৪ গ্রাম
জল ২½ আউন্স
রাইস্ট্রা কোয়ারিক অ্যাসিড ১.৬ সি.সি.
(৫০%)

(৩) আর (২) একত্র। তাতে ১৫০
ফোঁটা কার্বলিক অ্যাসিড বা
ফর্মালিন দাও। দরকার
মত জল দিয়ে ১২ আউন্স কর।

এই কালিতে ৩/৪ মাস খুব গাঢ় পড়বে, তার
পর পরিষ্কার হবে। নূতন কালির লেখা
প্রথমে খুব ফিকে হবে, ২/১ দিনের
মধ্যে গাঢ় হবে।

রা. ব.
৩১/৬/৫১.

(পরশুরাম তাঁর নিজের তৈরি কালিতে লিখতেন। সে-কালি তৈরির পদ্ধতি তিনি লিখে দিয়েছিলেন—এটি তারই প্রতিলিপি। শ্রীযুত অমরেন্দ্র কুমার সেনের সৌজন্যে এটি প্রাপ্ত।)

স্মরণে

ওদের কথা আর বলবেন না, ওরা regularly ট্রেন ফেল করে—বলেছিলেন পরশুরাম তাঁর সেই অনবদ্য ভঙ্গিতে। ওদের অর্থ 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকার পরিচালকরা! বহু চেষ্টা, বহু আয়াস সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের একটা নির্দিষ্ট তারিখ আমরা করতে পারিনি। এ নিয়ে এ-ধরনের কথা অনেকবার বলেছেন কিন্তু ট্রেন-ধরা যাকে বলে তা আর আমাদের হয়ে ওঠেনি।

অথচ সেই অক্ষমতার জন্য তাঁর স্নেহের স্রোতে ভাঁটা পড়ে নি কখনও। সবচেয়ে শেষে গিয়ে দাঁড়িয়েছি পুজোসংখ্যার লেখার জন্যে—উঠে গিয়ে তাঁর নিজের হাতে-তৈরী-ঘামে-পোরা লেখাটি এনে দিয়েছেন—বাঁদিকের উপরের কোনায় তাঁর নিজেরই তৈরি কালিতে লেখা 'তরুণের স্বপ্ন', নিচের কোনায় রবার-স্ট্যাম্প দেওয়া তাঁর নাম ঠিকানা। নিজেরা লজ্জা পেয়েছি, কিন্তু কথার স্রোত লেখা ছেড়ে অন্য পথ ধরেছে—মনেই হয় নি, বাজারে যখন পুজো সংখ্যা বেরোতে সুরু করেছে তখনও তিনি লেখাটি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছেন—তাঁরই স্নেহধন্য একটি পত্রিকার জন্য।

মনে আছে—প্রথম যেবার তাঁর কাছে লেখার জন্যে যাই। সঙ্গে ছিলেন তাঁরই একটি নাতনি—স্নেহ চৌধুরী। 'তরুণের স্বপ্ন' সেবারই প্রথম মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়েছে—নিছক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে। পরশুরামের দরবারে গুচ্ছি লেখা চাইতে—সঙ্কোচ এবং কুণ্ঠার অবধি ছিল না সে-মাত্রায়। কিন্তু সামনে গিয়ে তা মনেও রইল না! স্নেহ পরিচয় দিয়ে বললে—ন-দাদু, এ আমার বন্ধু, এদের পত্রিকার পুজো সংখ্যার জন্যে একটি লেখা চাইছে।

জানতে চাইলেন কি কাগজ, কদ্দিন বেরুচ্ছে। বললাম। উঠে ঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন সেই একটি খাম—। হাতে দিয়ে বললেন—প্রুফটা আমায় দেখিও।

আনন্দে সেদিন আর কথা বলতে পারিনি। বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপরে একদিন গেলাম লেখার প্রুফ নিয়ে, আরও নিয়ে গেলাম কিছু রেখাচিত্র শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা। যদি তিনি অনুমতি দেন তাহলে লেখার সঙ্গে তা ছাপা হবে। প্রুফ দেখে দিলেন—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ছবির। সুযোগ পেয়ে ছবিগুলোতেও সই করিয়ে নিলাম। অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে আছে তা।

তারপর কাগজ বেরোল। পরিচালক গোষ্ঠী তখন বিব্রত—লেখার জন্যে কি প্রণামী দেওয়া উচিত তাই ভেবে। কোন কিছু স্থির করা গেল না। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল তাঁর কাছেই গিয়ে আত্মসমর্পণ করা যাক। অতি সংকোচের সংগে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করলাম। শুনে একটু চুপ করে রইলেন—তারপরে বললেন: লেখার বিনিময়ে টাকা আমি নিই, কিন্তু তোমাদের কাছে নেব না। এত যত্ন করে দু'রঙে তোমরা আমার লেখাটি ছেপেছ যে এর পূর্বে আর কেউ তা করেনি।

স্বল্পবাক্ মানুষটি এই বলে চুপ করে রইলেন। আমরাও। তারপরে এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর সে প্রশ্ন ওঠে নি। বিনা আয়াসে পুজোর উপহারের মত তাঁর লেখা পেয়েছি।

আর এই যে যাবার পথ গেলাম সে পথ বন্ধ হয় নি কখনও। যখনই গিয়েছি স্নেহের আহ্বানে অভিভূত

হয়েছি। কাগজ সম্বন্ধে কত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেছেন—কোন লেখাটি কেমন লেগেছে—কে কেমন লিখছেন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা সুরু করে দিয়ে চুপ করে যেতেন। আপন মনে বকতে বকতে একসময় আমাদের খেয়াল হয়েছে—ইজিচেয়ারটিতে উনি চুপ করে শুয়ে আছেন। মিতভাষী ছিলেন—আমাদের কথার স্রোতে হয়তো ক্লান্ত হয়েছেন কিন্তু বুঝতে দেন নি কখনো। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চালিয়ে দিয়েছেন কখন আমাদেরই অজ্ঞাতে।

পরশুরামের হস্তাক্ষর অতুলনীয়। প্রেসে দেবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি দিতেন কোথাও কোন খুঁত থাকত না তার। লোভে পড়ে একবার আমরা অনুমতি চেয়েছিলাম তাঁর পাণ্ডুলিপিটি ব্লক ক'রে ছেপে দেবার। প্রস্তাবটি শোনামাত্র পরশুরাম শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"না না, ওটা করা উচিত হবে না। এতটা প্রাধান্য শুধু রবীন্দ্রনাথকেই দেওয়া চলত—আর কাউকে না।" কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে আমরা ধরে পড়লাম—অনুমতি দিতেই হবে। আর সে অনুমতি যে মিলেছিল তরুণের স্বপ্নের পাঠকরা তা জানেন। নিজেকে সর্বদা আড়ালে রাখার এই যে চেষ্টা এটা তাঁর স্বভাবধর্ম। আর এ জন্য ফোটো তোলাতেও ছিল তাঁর তীব্র আপত্তি। তবু ফোটো তুলতেও তিনি অনুমতি দিয়েছেন। সে-ফোটোর সঙ্গে আমাদের পাঠকদের পরিচয় আছে। এ-সংখ্যাতেও তার কিছু ছাপা হলো।

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য—তরুণের স্বপ্নকে তিনি স্নেহের চোখে দেখেছিলেন এ কথাটিই আজ স্মরণ করা। এ-স্মৃতি পূরণ হবার সম্ভাবনা নেই। স্মরণের মধ্য দিয়েই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি শুধু।

যতবার গিয়েছি তাঁর কাছে—প্রণাম করেছি। কিন্তু প্রতিবারই বাধা দিয়ে বলেছেন—গায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা সেকেলে পদ্ধতি। আজ শেষ প্রণাম দেবার বেলা তিনি সামনে নেই—সেকেলে পদ্ধতি আজ অচল। উদ্দেশ্যেই প্রণাম নিবেদন করি আজ।

মনীষী ব্যক্তিদের মহাপ্রয়াণে স্মৃতিকথা লেখা সম্পাদকীয় কর্তব্য—কিন্তু পরমাত্মীয় বিয়োগে? অনুভূতি সেখানে স্পন্দনহীন। আপন মনের গভীরে একটি মাত্র সুর বাজে—"সব মানি, সবচেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন!"

মালবিকা দত্ত

বজুঁর ইউরোপ

বিক্রমাদিত্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হোটেল ভার্দো রাস্তার মধ্যিখানে। অথচ রাস্তাটা একমুখী অর্থাৎ ফরাসী ভাষায় যাকে বলে সাঁ জিউদিক। তাই বিক্রমাদিত্যকে আবার বেশ খানিকটা পথ ঘুরতে হলো। হোটেলে এসে যখন পৌছল তখন প্রায় রাত্রি এগারোটা।

হোটেল বেশ ছোট। কিন্তু লোকের অভাব নেই। পাঁচমিশালী লোকে 'ঘর' পরিপূর্ণ। এর মধ্যে পুষ্পকে খুঁজে নেওয়া বেশ মুস্কিলের কাজ। তাই বিক্রমাদিত্য হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলে—ভূ……

প্রশ্নটা শেষ করতে হলো না বিক্রমাদিত্যর। ফোয়ারার মতো কথা ছুটলো ম্যানেজারের—ভূ শাসে লা দাম জ্যান্দু। এল আবিত প্রমিয়ার এতাজ। ওঃ মঁশিও— এ মালাদ।

মঁশিও!—ম্যানেজারের কথা শুনে বিক্রমাদিত্য স্তম্ভিত হলো। প্রতিবাদ করে বললে, তুমি ভুল করেছ। মাদাম একাই থাকেন এখানে। মঁশিও কেউ নেই।

বিক্রমের হাসি দেখে গেলো ম্যানেজারের মুখে। বললে, সে ভুল করেনি। মাদামের সঙ্গে এক ফরাসী ভদ্রলোকও থাকেন। মঁশিও অসুস্থ। ডাক্তার এসেছিলো কিন্তু মঁশিও ডাক্তারকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভূ সাভে কেসকিল আ ফে। লা দক্তর এ ভেনুই। মঁশিও এ ফাঁসে। ইল আ ফ্লাঙ্কে লা দক্তর আঁদা পোর্ত। মাদাম আ প্যয়র—

ম্যানেজারের কথা শেষ হবার আগেই বিক্রমাদিত্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। ম্যানেজার চেঁচিয়ে বললে, শাম্বর সেইজ—আ দ্রোয়াত।

ঘর খুঁজে নিতে বিক্রমাদিত্যের দেরী হলো না। দরজায় টোকা দিতেই পুষ্প বেরিয়ে এলো।

আজ পুষ্পকে দেখে বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হলো। চেহারার একি পরিবর্তন! চোখের নীচে কালির রেখা দেখা দিয়েছে, চুল এলোমেলো। দেখলেই মনে হয় যেন কোন বিপদের ভেতর দিয়ে তার জীবন বয়ে যাচ্ছে।

বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞেস করলে: কী হয়েছে পুষ্প তোমার? দেখলেই মনে হয়—

কথায় বাধা দিলে পুষ্প। বললে, নীচে চলো বিক্রম, সব বলছি।

বারে এসে দুজনে বসলে। বিক্রম ওয়েটারকে ডেকে বললে, কনিয়াক পুর মাদাম, পেরনো পুর মোয়া।

পুষ্প বাধা দিলে। বললে, না না, আমার ব্রাণ্ডি চাইনে। লেমন ওয়াটার হলেই চলবে। ওয়েটার একটু বাদে এসে লেমন ওয়াটার ও পেরনো রেখে গেলো। বিক্রমাদিত্য এবার জিজ্ঞেস করলে, মঁশিও কে? হোটেলের ম্যানেজার বলছিলো মঁশিও মালাদ। তাই বিস্মিত না হয়ে পারিনি। তোমার স্বামী নাগারকার পারীতে এসেছে একথা তো জানতুম না?

লেমন ওয়াটারের গ্লাসটা হাতের মধ্যে নাড়া চাড়া করতে করতে পুষ্প জবাব দিলে, মঁশিওর নাম

মিশেল, বিক্রমাদিত্য, নাগারকার নয়। আজ দীর্ঘ তিন বছর হলো স্বামীর মুখ দেখিনি, দেখবার কোন সম্ভাবনা নেই—

: মিশেল—একটু জোরেই বিক্রমাদিত্য নামটা উচ্চারণ করলে। তার কথা শুনে পাশে টেবলের দু একজন বিস্মিত হয়ে বিক্রমাদিত্যের পানে তাকালো। বিক্রমাদিত্য একটু লজ্জা পেলো। কিন্তু পুষ্পের কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। বরং সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিলে: সে দীর্ঘ কাহিনী বিক্রমাদিত্য, পরে বলবো। কিন্তু বর্তমানে একটু বিপদে পড়েছি।

: কী হয়েছে খুলে বলো।

: মিশেল আর আমি আজ তিনমাস যাবৎ একই হোটেলে একই ঘরে আছি। দুদিন আগে মিশেলের সাথে আমার একটু ঝগড়া হয়। সামান্য ব্যাপার নিয়ে। ভেবেছিলাম আমাদের মনোমালিন্য দূর হয়ে যাবে। কিন্তু হয়নি। আজ সকালে ঝগড়াটা বেশ দানা বেঁধে উঠে। আমি মিশেলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিই আমাকে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কথাটা বলে আমি বেরিয়ে পড়ি।

বিকেল নটার সময় ঘরে ফিরে দেখি দোর বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিলাম কিন্তু কেউ দোর খুললে না। ম্যানেজারের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি আনিয়ে দোর খুললাম। ভেতরে ঢুকে দেখি মিশেল শুয়ে আছে।

ডাক দিলাম: মিশেল!

কোন জবাব নেই। শুধু মিশেলের গোঙানি শুনতে পেলাম। অনেকদিন থেকেই মিশেলের পেটে একটা ব্যথা ছিলো। উত্তেজনায় সে যন্ত্রণাটা বাড়ে। বুঝতে অসুবিধে হলো না তার ব্যথা বেড়ছে। ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি ম্যানেজারকে গিয়ে বললাম, ডাক্তার চাই।

ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলে, কেন?

মঁশিওর অসুখ করেছে।

ডাক্তার এলো। কিন্তু ডাক্তার ঘরের ভিতর ঢুকতেই মিশেল তার গোঙানির ভিতর চীৎকার করে উঠলো। বললে: বেরিয়ে যাও। আমি তোমাকে চাইনে।

আমি অপ্রস্তুত হলাম। ডাক্তারও রেগে গেলো। বললো, আর কখনও আসবে না। বলতে বলতে পুষ্প থামলে। তারপর আবার বলতে লাগলো: ডাক্তার চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ চাপ ছিলো। কিন্তু ঘণ্টাখানেক হলো আবার গোঙাতে শুরু করেছে। কী করবো ভেবে পাচ্ছিনে। হঠাৎ তোমার কথা মনে হলো বিক্রমাদিত্য। তাই তোমাকে টেলিফোন করলাম।

বিক্রমাদিত্য ভেবে দেখলো, ব্যাপারটা জটিল। এর মধ্যে নিজেকে জড়ানো উচিৎ হবে কিনা সেটা চিন্তার বিষয়।

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে: সাহায্য করতে দ্বিধা হচ্ছে বিক্রম? কিন্তু আজ পারীতে আমি কতো অসহায় জানো তো। তোমাকে ছাড়া আমি কাকে বিশ্বাস করতে পারি?

নারীকণ্ঠে মিনতির স্বর শুনে বিক্রমাদিত্যের সমস্ত ইতস্তত ভাব দূর হয়ে গেলো। বললে: না, দ্বিধা হবে কেন। কিন্তু ভাবছি কী করা যায়।

পুষ্পই উপায় বাতলালে। বললে: হাসপাতালে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

বিক্রমাদিত্য ভেবে দেখলো প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু হাসপাতালে নেবার জন্যে একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। তাই জিজ্ঞেস করলে: যে ডাক্তার এসেছিলো তার নাম মনে আছে?

: হ্যাঁ। ডাক্তার বোনে। রু দ্য বোয়াসিয়েতে থাকেন।

: তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া যাক। দেখি তিনি সাহায্য করতে রাজী হন কিনা।

পুষ্পকে নিয়ে বিক্রমাদিত্য ডাক্তার বোনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

* * *

গাড়ীতে বসে পুষ্প মিশেলের প্রকৃত পরিচয় দিলে। বললে: তিন বছর আগে যখন বোম্বাই ছেড়ে ইয়োরোপে এলাম তখন কখনও ভাবিনি যে আজ আমাকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে জেনিভাতে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ স্কুলে ভাষা শিখতে এসেছিলাম। ছ মাস আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে লুগানে গিয়েছিলাম 'ওয়াটার স্কীং' করতে। সেইখানেই আমার মিশেলের সাথে প্রথম পরিচয় হয়।

মিশেল জাতে ফরাসী, পেশায় আর্টিস্ট। বাপের সম্পত্তি একমাত্র রোজগার। একদিন সকালবেলা স্কীং করে ফিরছি এমনি সময় মিশেল এসে আমার সঙ্গে যেচেই আলাপ করলে।

: তুমি ভারী সুন্দরী। তোমার একটা পোর্ট্রেট করবো।

মিশেলের কথা শুনে ভারী লজ্জা পেলাম। কিন্তু ভাবে আমার লজ্জা প্রকাশ করিনি। আর পোর্ট্রেট করার কথা শুনে আমার ভারী কৌতূহল হলো। কৈ আজ অবধি কেউ তো আমায় সুন্দরী বলে তারিফ করেনি। কেউ তো আমার ছবি আঁকতে চায়নি। মিশেলের অনুরোধ উপেক্ষা করলাম না।

এই ছবি আঁকা থেকেই আমার মিশেলের সাথে হৃদ্যতা। প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমাদের এই পরিচয় ক্ষণিকের। কিন্তু যখন দিনের পর মাস গেলো তখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের বন্ধন দৃঢ় হয়েছে।

স্কুল খুললে আমি জেনিভাতে এলাম। মিশেলও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো। আমি মিশেলকে এড়াতে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে চায় না। প্রথমটায় লোকটার প্রতি আমার কোন অনুরাগই ছিলো না কিন্তু আমাকে পাবার জন্য ওর আকাঙ্খা দেখে আমারও মনের পরিবর্তন হলো। আমি মিশেলের প্রেমে পড়লাম।

স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করেছি বহুদিন থেকে। তাই বিবাহিত জীবনের আস্বাদ ছিলো আমার কাছে বিস্মৃতপ্রায়। মিশেল এসে আমার সেই বিস্মৃত জীবনকে নতুন করে তুললে।

জেনিভা ত্যাগ করে পারীতে এলাম। এ শহরে আমি আছি একথা আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে অজ্ঞাত। পরিচিত জনমানবের হাত থেকে এড়াবার জন্যে মিশেল আমাকে সাঁ ভেনীর এই অঞ্চলে নিয়ে এলো। বললে: পুষ্প এ-অঞ্চলের কলঙ্ক আছে। তাই সহজে কেউ এখানে আসবে না। তারপর কিছু দিন বেশ ছিলাম। কেউ এসে আমাদের ভালবাসার জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়নি।

: ভালবাসার জীবন। সত্যিই কিছুদিন পরে এই প্রশ্নটা আমার মনে জাগলো। সত্যিই কী আমি মিশেলকে চাই—সত্যিই কী মিশেল আমাকে ভালবাসে। আমি ভারতীয় নারী, আব্রুর ভেতর মানুষ হয়েছি। আজ এ কী করছি!

একদিন মিশেল আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে। আমি চিন্তায় পড়লাম। ভাবলাম হয়তো

বর্তমানে মিশেলের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি কিন্তু বিয়ের পর তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তাই মিশেলের প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেলাম।

জানি না মিশেল কী মনে করলে। হয়তো আমার অনিচ্ছা বুঝতে পারলে। বুঝতে পারলে যে আমি তার কাছ থেকে চলে যেতে চাইছি। তার ব্যবহারে ক্রমেই পরিবর্তন দেখা দিলে। আমিও ঠিক করলাম যে আর নয়। এবার মিশেলের হাত থেকে আমার মুক্তি পেতেই হবে। ক্রমে ক্রমে আমাদের মনের গরমিল ঝগড়ায় এসে দাঁড়ালো। মিশেল যা বলে আমি তার প্রতিবাদ করি। আমার প্রতিবাদে মিশেল অন্তরে অন্তরে ব্যথা পেতো। মুখে কিছু বলতো না বটে কিন্তু মনের ভাবে তা প্রকাশ পেতো। তারপর আজ দুদিন থেকে ঝগড়া সুরু হলো। এর পরের কাহিনী তুমি জানো বিক্রম। বলে আর তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে।

পুষ্পের কথাগুলো বিক্রমাদিত্য রূপকথার মতো শুনেছিলো। এতোক্ষণ কোন প্রশ্নবাদ করেনি। এবার না করে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে : শুনেছি তোমার দাদা প্রেমনাথ লণ্ডনে। তিনি এই ব্যাপারের কিছু জানেন ?

: না। বলিনি। দাদাকে জানাবার মতো মুখ আমার নেই বিক্রম—

গাড়ী রুস্ত বোয়াসিয়েতে এসে থামলো। অন্ধকারের মধ্যেও ডাক্তার বোনের বাড়ী খুঁজে নিতে সময় নিলে না।

অনেক ডাকাডাকির পর ডাক্তার বোনে নীচে নেমে এলেন। কোন কিছু বলবার আগেই পুষ্পকে দেখে তিনি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন : অসম্ভব। ও রুগীর কাছে আমি আর কখনও যাচ্ছিনে।

বিনয়ের সুরে বিক্রমাদিত্য বলে : আপনাকে যেতেই হবে। রুগীকে হাসপাতালে নিতে হলে আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

: এম্বুলেন্সে খবর দিন। তারা এসেই সব বন্দোবস্ত করবে।

: আপনি থাকলে এম্বুলেন্স পেতে অসুবিধে হবে—

: রুগী আমাকে অপমান করেছে। আমার ফী দেয় নি। তার কাছে আমার যাওয়া অসম্ভব।

: এবার আর অপমান করবে না, ফী পেতে অসুবিধে হবে না।—শান্ত কণ্ঠে বিক্রমাদিত্য ডাক্তার বোনের কথার জবাব দিলে।

অনেক সাধ্য সাধনার পর ডাক্তার বোনে মিশেলকে দেখতে রাজী হলেন। বিক্রমাদিত্যের গাড়ী করে তারা যখন হোটেল ভার্দোতে এসে পৌছল তখন রাত প্রায় বারোটা।

বিক্রমাদিত্য ঘরের ভেতর ঢুকে দেখে জিনিষপত্র চারদিকে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। ঘরের একপ্রান্তে একটি বিছানা। তাইতে একটি ত্রিশ বত্রিশ বছরের ছেলে শুয়ে আছে। বুঝতে অসুবিধা হলো না —ছেলেটি মিশেল।

পুষ্প ডাক দিলে : মিশেল!

কিন্তু কোন জবাব এলো না। ডাক্তার বোনে পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটু দেখে বললেন : জ্ঞান নেই, একে এক্ষুনি হাসপাতালে সরানো দরকার।

ডাক্তার বোনের কথা শুনে পুষ্পের মুখ শুকিয়ে গেলো। কোন কথা বললে না, চুপ করে রইলে।

ডাক্তার আবার নাড়াচাড়া করে বললেন : মনে হচ্ছে কিছু খেয়েছে। কিন্তু জিনিষটা যে কী ঠিক বুঝতে পারছি নে।

এম্বুলেন্সকে খবর দিতে ডাক্তার বোনে নিজেই গেলেন। হোটেলের ম্যানেজারও খবর পেয়ে উপরে ছুটে এলো। বললে : কী বিপদ দেখুন তো। অনর্থক আমার হোটেলের বদনাম হলো।

এ কথার জবাব না দিয়ে বিক্রমাদিত্য বললে : আপনার হোটেলের দেনা-পাওনা কী আছে ?

: গত সাতদিনের টাকা বাকী।

একথার প্রতিবাদ করলে পুষ্প। টাকা আপনি আগাম নেন। কাজেই কোন টাকাই বাকী থাকতে পারে না।

হোটেলের ম্যানেজার পুষ্পের জবাব শুনে থতমত খেয়ে গেলো। বললে : কিন্তু সার্ভিস চার্জ, টেলিফোন বিল, বারের প্রাপ্য এখনও মেটানো হয়নি।

: না, সে টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে। গতকাল মিশেল আপনাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়েছে। তার হিসেব ও ফেরৎ টাকা আপনি এখনও দেননি।

বার বার বাধা পেয়ে ম্যানেজার একটু রুক্ষ স্বরে বললে : বেশ, মানলাম সে টাকা না হয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লণ্ড্রীর টাকা—তারপর আমার হোটেলের যে বদনাম হলো তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে শুনি !

বিক্রমাদিত্য জবাব দেয় : বেশ পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের কোন টাকা আপনাকে ফেরৎ দিতে হবে না ! সে টাকা আপনি স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন। বরং আপনাকে উপরি আরো হাজার ফ্রাঙ্ক দিচ্ছি এই অনর্থক ঝামেলার জন্যে। এ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই।

ম্যানেজার গজরাতে লাগলো। তার মুখ দেখে মনে হলো এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হয়নি। মিশেলের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকাই সে পেয়ে এসেছে। ভেবেছিলো এবারও টাকা বেশ ভালো করেই আদায় করবে।

ডাক্তার বোনে একটু বাদেই ফিরে এলেন। বললেন : এম্বুলেন্স এসে গেছে।

ধরাধরি করে মিশেলকে এম্বুলেন্সের গাড়ীতে তোলা হলো। এই নিয়ে হোটেলের ভেতর এক গুঞ্জরণ উঠলো। কেউ বললে : অসুখ। কেউ বললে : আত্মহত্যা। বিশেষ করে ভারতীয় মেয়ে পুষ্পকে এই ব্যাপারে জড়িত দেখে সবার কৌতূহলই বেশী। সবাই জানতে চায় পুষ্পের সাথে মিশেলের কী সম্পর্ক। প্রশ্নের শেষ নেই।

ডাক্তার বোনের হাতে ছ'হাজার ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিয়ে বিক্রমাদিত্য বললে : ডাক্তার, আপনি অনেক করেছেন। এতোগুলো টাকা পেয়ে ডাক্তার একটু খুসীই হলেন। বললেন : ধন্যবাদ।

বিক্রমাদিত্য পুষ্পকে জিজ্ঞেস করলে : তুমি কী করবে ?

পুষ্প বললে : তোমার এলাকায় জানাশোনা কোন হোটেল আছে ?

: এই রাত্তিরে পাওয়া অসম্ভব। তার চাইতে আজকের রাত্রিটা আমার হোটেলে কাটিয়ে দাও। কাল তোমার আস্তানা খোঁজা যাবে।

বাক্স প্যাটরা নিয়ে পুষ্প বিক্রমাদিত্যের সাথে চলে এলো। মিশেলের জিনিষপত্র হোটেলের ম্যানেজারের জিম্মায় রেখে গেলো। বললে : হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে নেবে।

পরদিন বিক্রমাদিত্য পুষ্পের দাদা প্রেমনাথকে টেলিফোন করলে। বললে : পারীতে তোমার আসা একান্ত প্রয়োজন। পুষ্পের ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে একটু পরামর্শ করতে চাই।

: পুষ্প! প্রেমনাথ বিক্রমাদিত্যের মুখে পুষ্পের নাম শুনে একটু আশ্চর্যান্বিত হলো। পুষ্প তো জেনিভায়।

: না, পারীতে আছে পুষ্প।

এবার একটু ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রেমনাথ বললে : কী ব্যাপার বলো তো?

: এলেই সব বলবো। দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে এসো।

পরদিন প্রেমনাথ পারীতে এসে পৌছল। প্রেমনাথকে আনতে বিক্রমাদিত্য গেয়ার দ্য নরে গিয়েছিলো। রাস্তায় প্রেমনাথ জিজ্ঞেস করলে : কী ব্যাপার বলো তো?

বিক্রমাদিত্য সমস্ত ঘটনা বললে। কথাগুলো প্রেমনাথের কানে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হলো। বললে : অসম্ভব। পুষ্প একটা বিদেশী পুরুষের সঙ্গে অখ্যাতপল্লীতে বাস করতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে বিক্রম।

বিক্রমাদিত্য হাসলে। বললে : তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করলেই সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে পারবে।

পুষ্পকে প্রেমনাথ কোন প্রশ্ন করলে না। শুধু একদিন বাদে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলে : কী করা যায় বলো তো!

: দেশে ফেরৎ পাঠানো ছাড়া আর কোন পথ দেখছি নে।

: কিন্তু এই কেলেঙ্কারীর পর দেশে ফিরে যাবে কী?

: বলে দেখো। হাজার হোক তুমি ওঁর ভাই। তোমার কথা শুনলেও শুনতে পারে।

প্রেমনাথ চুপ করে রইলো। কিছুক্ষণ বাদে আবার বললে : আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। ভাবছি পুষ্পকে কোন ডাক্তার দেখাবো। কারণ সুস্থ প্রকৃতিতে পুষ্প এমনি ধরনের কিছু করতে পারে এ আমি ভাবতেই পারি নে। তুমি কী বলো?

বিক্রমাদিত্য ভেবে দেখলে প্রস্তাবটা মন্দ নয়। ডাক্তার পুষ্পকে দেখলে ক্ষতি নেই। তাই প্রেমনাথের প্রস্তাবে সায় দিলে। বললে : কথাটা মন্দ বলো নি কিন্তু পুষ্প রাজী হবে কী?

: সে দায়িত্ব আমার। কিন্তু ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই। তোমার পরিচিত কোন ডাক্তার আছে বিক্রম?

: পরিচিত না বিশ্বস্ত?—বিক্রমাদিত্য হেসে প্রশ্ন করে।

: দুটোই।

পারীতে বিক্রমাদিত্য নবাগত। তাই চট করে কোন নাম করতে পারলে না। বললে : দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

সেদিন বিকেলে প্রেমনাথকে নিয়ে বিক্রমাদিত্য পারী শহর দেখাতে বেরুলো। সারা শহর ঘুরে, মর্মাত পার হয়ে 'সানে কোরে' এসে যখন পৌছল তখন রাত প্রায় সাতটা।

'সানে কোরের' সামনে এসে রেলিংএ ভর দিয়ে দুজনে দাঁড়ালো। দূরে পারী নগরী আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে। ডান পাশে মর্মাতের বুভুক্ষু শিল্পীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকেই লোকের গুঞ্জন, আলোর লহরী।

জনতার পানে তাকিয়ে প্রেমনাথ বললে : সত্যি সত্যি লণ্ডনে এতো হৈ-হল্লা কখনই দেখা যায় না। এতো সুন্দরী মেয়ে কখনই দেখি নি। 'এরা কী সবাই—

: সবাই নয়। অল্প সংখ্যক আছে যাদের আমরা ফরাসী ভাষায় বলি 'এতোয়ার'। অর্থাৎ বোম্বাইতে যাদের তুমি দেখতে পাও ভেণ্ডী বাজারে।

: আমার কিন্তু আর একটা কৌতুহল আছে। শুনেছি এদের নাইট ক্লাবের অধিকাংশ মেয়েই বিদেশিনী, কথাটা সত্যি?

বিক্রমাদিত্য প্রেমনাথের কথা শুনে হাসলে। বললে : ভাই প্রেম, তুমি পারীর অনেক কিছুই জানো। তোমার অনুমান সত্যি। পারীর নাইট ক্লাবের অধিকাংশ মেয়েই বিদেশিনী—ইংরেজ, ডাচ, জর্মান। খুব অল্প সংখ্যকই ফরাসী।

এমনি মুখরোচক আলাপ-আলোচনায় তারা যখন ব্যস্ত তখন কে যেন বিক্রমাদিত্যের নাম ধরে পেছন থেকে ডাকলে—'রসোঁয়ার মঁশিও কমা সাভা।'

মেয়েলি কণ্ঠস্বর! বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখে—মাদেলিন।

ক্রমশঃ

বিশেষ কারণবশতঃ এই কাহিনীর চরিত্রের নামের অদল বদল করা হলো।—লেখক

অন্তরা

[চার]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এর পরের কথাটি মনে মনে উচ্চারণ করতেও সংকোচ হচ্ছে, বেসুর শোনাচ্ছে নিজের কাণে, চিন্তা করতেও নিদারুণ লজ্জায় শিউরে উঠছে অন্তর! তবু, এইখানে চুপিচুপি ব্যক্ত করে যাই,—সেই আসঙ্গ-লিপ্সাতুর মূর্তি দুটি দেখতে দেখতে, হঠাৎ ছিট্‌কে সরে এসেছিলাম অরুর কাছ থেকে। মনে হচ্ছিল, দুটি মানুষ পাষাণ হয়ে গিয়ে আবার কখন বুঝি মানুষ হয়ে উঠেছে! আমি দেখতে পাচ্ছি, দুটি ব্যগ্র বাহু কেমন করে বেষ্টন করে রয়েছে পুরুষটির কণ্ঠদেশ। আমি দেখতে পাচ্ছি, দুটি তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠাধরের মৃদু কম্পন, স্বপ্নাবেশ-নিমীলিত দুটি চোখের অধীর ব্যঞ্জনা! আর যেন অনুভব করছিলাম, বিবসনা নারীর কটিদেশে কোন এক পুরুষ-হস্তের সুকঠিন স্পর্শ!

ছিঃ-ছিঃ! কী লজ্জা! এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পসৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কেন আমার মনে এলো এসব কথা! আর, মনেই এলো যদি, ছিট্‌কে সরে এলাম কেন ওর মতো ছেলেমানুষটির সান্নিধ্য থেকে! কী ও মনে করবে? আমি যে ঘোরতর লজ্জা পেয়েছি, সে কথা যদি ও ঘুণাক্ষরে বুঝে থাকে ত, সে লজ্জা হবে আমার দ্বিগুণ—চতুর্গুণ! আমার বয়স! আমার এই পরিণত বয়সে আমি হঠাৎ কিশোর-বয়সী মেয়েদের মতো আচরণ করতে গেলাম কেমন করে?

জানি না, ঠিক কী মনোভাব তখন হয়েছিল অরুর, খুব কাছে সরে না এসে, একটু দূর থেকেই ও বললে—যাক্ পাষাণেও তাহ'লে প্রাণ আছে?

দ্রুত মুখ ফেরালাম ওর দিকে, বললাম—তার মানে?

অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারা যায় না, মুখ আপনিই নত হয়ে আসে। ও বললে—না হলে তুমি অমন করে পালালে কেন?

ওর কাছ থেকে সরে এসে আশ্রয় করেছিলাম একটি স্তম্ভ, হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ল, তারও মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে লাস্যময়ী এক তরুণী! মনে হল্লো আমার চারিদিকের সমস্ত পাষাণ বুঝি মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে গেছে! এক অভূতপূর্ব লীলা-চাপল্যে ভ'রে গেছে হাজার বছর আগেকার এই মন্দির-

প্রাঙ্গণ! দেবতা প্রাণ পেয়েছে, পশু প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে সমস্ত নর আর নারী! পশুত্ব, মনুষ্যত্ব আর দেবত্ব যেন মুহূর্তে একাকার হয়ে গেছে! আমি পশু, আমি মানুষ, আমি দেবী, এই ত্রিভাব মুহূর্তে আমার অন্তরের প্রত্যন্ত-প্রদেশে যেন একসঙ্গে নৃত্য করে উঠল! ইচ্ছা হলো, বিস্মিত-বিহ্বল হয়ে আমার সামনে ঐ যে আজকের মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে ওকে বুকে টেনে এনে পশুর মতো হিংস্রতায় নিমেষে নিষ্পেষিত করে ফেলি! ইচ্ছা হলো, ওকে টেনে নিয়ে মানুষের মতো স্নেহ দিয়ে ওর সমস্ত দুঃখ আর ব্যথাকে দূর করে দেই! ইচ্ছা হলো, দেবীর মতো ওর সামনে তুলে ধরি বরাভয়, প্রসন্ন ক্ষমায় ওর সমস্ত অঞ্জলি আমার দুটি হাত দিয়ে গ্রহণ করি!

আরও কয়েক পা বুঝি আমার দিকে এগিয়ে এলো অরু, অস্ফুট কণ্ঠে বললে—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—এসো!

—চলো।

বুঝি সম্মোহিতের মতো চলতে লাগলাম ওর পিছনে-পিছনে। নির্জন পার্বত্য পথে স্ত্রী-পুরুষে-যেমন চলে, কখনো নিচুতে নামে, কখনো ওঠে, একজনের পিছনে পিছনে আর একজন, ঠিক তেমনি। ও এক সময় এক যায়গায় এসে থেমে বললে—চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, আগাগোড়া গ্রানাইট পাথরে তৈরী। দেখছ? কালীমন্দির। চৌষট্টি যোগিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল, এখন সব নেই, ভেঙে গেছে?

—ওরা কোথায়?

ও আমার এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে বোধ হয় অবাকই হলো, দুই বিস্মিত চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কারা?

—লতা।

হেসে উঠল, বললে—মোটরে করে ওরা ঘুরছে। জোর করে ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা গেছে এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে, দক্ষিণ দিককার মন্দিরগুলি দেখতে। যাকে বলে দক্ষিণ-অঞ্চল।

—আমরা যাবো না?

ও বললে—নিশ্চয়ই। ওরা ফিরে আসুক। পঁচাশিটি মন্দিরের মধ্যে মাত্র বিশটি বেঁচে আছে। তা-ও তিন ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ অঞ্চলটা দূরে। আর, আমরা আছি তখন পশ্চিম অঞ্চলে। সাকিটহাউস থেকে মাত্র আধমাইল হচ্ছে এর দূরত্ব। এখান থেকে ফিরবো আবার ঐ পথেই। ফিরে আরও আধ মাইল হেঁটে খাজুরাহ গ্রামের দিকে যাবো, সেখানে আছে পূর্ব অঞ্চলের মন্দিরগুলি। আর আছে নিনোরা তাল সরোবর। ঐখানেই ওরা এসে থামবে, কথা আছে। ওদের সঙ্গে দেখা হবে ওখানেই।

ভিতরের বিস্তৃত চত্বরটিতে ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। বলতে বলতে একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, এতো নির্জন কেন? লোকজন নেই? সেই সাহেব মেমরা? মারাঠী ছাত্ররা?

একটু হেসে অরু বললে—সব গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ওদের প্রোগ্রাম জেনেই ত সবার থেকে আলাদা হয়ে গেলাম।

—কেন?

—তোমাকে কাছে পাব বলে।

—লাভ ?

—লাভ অনেক।

কী ও বলতে চায় জানি না, কিন্তু আমার ভিতরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। একবার মনে হল বলে ফেলি—থাক অরু, এবার ফিরে যাই।

কিন্তু হায় রে, এ-বয়সে সে সংকোচের প্রকাশ কি আর আমার সাজে? ভাবছে কি অরু? অথচ চলতে চলতে বার বার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, বার বার থেমে যাচ্ছি, এ-ও কী ওর এড়িয়ে যাবার কথা? যায় না বলেই এতো লজ্জা!

ও একসময় বললে—শিক্ষিকাকে কী শেখাবো বলো? ঐ হচ্ছে চাণ্ডেল্লা রাজবংশের কীর্তি, হাজার বছরের পুরানো। তার মধ্যে এই চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটি নাকি সব থেকে পুরানো—৯০০খৃষ্টাব্দ।

একটু হাসলাম এবার আমি, বললাম—আগে বললে না কেন?

—কী?

—নোটবই নিয়ে আসতাম। শিক্ষিকার কাজ করেই ত দিন কাটবে, যা বলছ, নোট কোট নিয়ে রাখি, আখেরে কাজে লাগবে।

আমার কথায় একটু বোধ হয় অপ্রতিভ হলো, বললে—থাক আর জ্ঞান দেবো না।

অমনি রাগ হলো! মনে মনে বললাম—কিছু-না-জানা কিছু-না-পড়া কিশোরী মেয়েটি হয়ে যাই, আর তুমি যতো পারো আমাকে সব বুঝিয়ে দাও, আমি সারা অন্তরভরে তা গ্রহণ করি।

কিন্তু সে স্বর ত ফুটল না কণ্ঠে, সে কিশোরী ত কথা বলতে পারল না। কথা বললো—ত্রিশ-পার-হয়ে আসা প্রবীণা এক নারীর কণ্ঠস্বর—কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দিরটি কোথায়?

অরু ফিরে তাকালো আমার দিকে, বললো জানোই ত দেখছি সব। এসো, সেখানেই যাই।

গাইডের মতো দুচারজনকে যে যেতে আসতে না দেখছিলাম এমন নয়, তাদের একজনের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে, ও আমাকে নিয়ে চলছে কাণ্ডারীর মহাদেও মন্দিরের দিকে। শুধু কাণ্ডারীয় কেন, লাঙ্গুলা মহাদেও, মহাদেও—তিনটী মহাদেবের মন্দির আছে। এর মধ্যে মহাদেও মন্দিরের সম্মুখে যে অদ্ভুত সিংহটি সামনের পা তুলে একটি বসে থাকা মেয়ের দুটো হাত আকর্ষণ করছে, সেটা দেখতে দেখতে আবার কেমন যেন হঠাৎ এক আতঙ্ক এলো অন্তরের মধ্যে। অস্ফুটকণ্ঠে নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় বলে উঠলাম—অরু? বিশ্লেষণ দৃষ্টি দিয়েও দেখছিল মন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্যশিল্প, আমার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন কেঁপে উঠল নিদারুণ চমকে। বললে—কী?

তারপরেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন মুখ? শরীর খারাপ লাগছে?

কী জানি কেন, চোখে বুঝি জল এসে পড়ল হঠাৎ। কোনক্রমে মুখ লুকিয়ে, মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। তারপরে অরু যা করল, সে এক দেখবার মতই দৃশ্য বটে! গাইডের মতো একটা লোককে ডেকে হৈ-চৈ করে গ্রামাঞ্চল থেকে একটা গাড়িই জোগাড় করে বুঝি!

আমি নিশ্চুপে হেঁটে এসে ওর পাশে দাঁড়ালাম, লোকটিকে বললাম—তুমি যাও, গাড়ির দরকার নেই। তারপর অরুকে বললাম—এসো অরু, সামান্য পথ, হেঁটেই যাই! আর দেখাও ত হলো এ-অঞ্চলের সব।

—তা না হয় হলো, তুমি হাঁটতে পারবে কেন?

মুখ টিপে হেসে বললাম—খুব পারব, না পারলে, তুমি একটু ধরবে। তোমার ভর পেলে আমার একটুও কষ্ট হবে না।

অরু থমকে দাঁড়িয়ে আমার কথার মধ্যে কোন তাৎপর্যই খুঁজতে লাগল বোধ হয়। তারপরে, গম্ভীরভাবে বললে—চলো।

চলতে লাগলাম। এবার আগে-পিছে নয়, পাশাপাশি। আমরাও রাস্তায় এসেছি, এমন সময় হুস করে থামল এসে একটা বাস্। নামল কিছু যাত্রী। ও বললে—বাসে যাবে? থামে কিন্তু সাকিট হাউসে।

—না।

হাঁটতে লাগলাম। বাস-টা বেরিয়ে গেল!

ও এক সময় বললে—কী রকম অসুখ যে হাঁটতে কষ্ট হয় না?

পরিহাসের সুরেই বললাম—কষ্ট হলেও কি তোমাকে বলব?

ও কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল মুহূর্তে, বললে—সে আমি জানি। সহস্র কষ্ট হলেও মুখ ফুটে তুমি বলবে না।

—জানলে কী করে?

—আমি জানি।

ওর হাতটা টেনে নিলাম হাতের মধ্যে, বললাম—পাগল! একেবারে পাগল!

উত্তরে ও কিন্তু কিছু বলল না, নিশ্চুপে সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে লাগল পথ। হাতটা অবশ্য ছাড়িয়ে নেয় নি, তেমনিই ধরা আছে আমার হাতে। এবং সে এক আশ্চর্য পথ চলা আমাদের! প্রায় নির্জন বললেই হয় পথ, পাশাপাশি চলেছি দুজনে, কেউ কোনো কথা বলিনি সাকিট হাউসে ফিরে আসা পর্যন্ত। কথা বলিনি বটে মুখ ফুটে, কিন্তু মন বলেছে। মন বলেছে, এইত বেশ! এইভাবে যদি কাউকে পাশে নিয়ে অনন্তকাল চলতে পারি, তাতে ক্ষতি কী?

বাড়ী পৌছে ঘরের দরজাটির কাছে গিয়ে, ওর হাত ছেড়ে দিয়ে কথা বললাম আমিই প্রথম। ও ততক্ষণে চাবি বার করে ঘরের তালায় হাত দিয়েছে। বললাম—বারান্দায় বসো না? বেতের চেয়ারে?

দরজা খুলে, আবার তা ভেজিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ, বসল এসে আমার পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে। রক্ষকমশাই ঘুরঘর করছিলেন এদিক-ওদিক, তাকে ডেকে অরু জিজ্ঞাসা করলে—কী, ঘর ছেড়ে দিতে হবে নাকি আজ? কালেক্টরের এত্তেলা এসেছে?

সে বললে—নেহী সাব! আপ আরাম কীজিয়ে।

তার মূর্তিটি বাড়ীর আড়ালে মিলিয়ে যেতেই আমি একটু হেসে বলে উঠলাম—নাও, করো আরাম।

অরু সে কথায় যোগ না দিয়ে গভীর ব্যগ্রতায় প্রশ্ন করলেন—স্থাপত্য কেমন লাগল? এখনো কিন্তু বাকী রয়ে গেল দুটি অঞ্চল।

বললাম—তা থাক। আর ঘুরতে ভালো লাগছে না। এখনই যদি সব দেখে ফেলি, ত, বিকেলে দেখব কী?

বললে—তা বটে। কিন্তু, ওরা সরোবরের ধারে অপেক্ষা করবে, ডেকে নিয়ে আসি, কেমন? তুমি বরং একটু বিশ্রাম করো।

বললাম—না, তুমি যেও না এখন।

একটু উৎসুক হয়ে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়ল অরু, তারপরে ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আমার কী যে হচ্ছিল আমার ভিতরে, আমিই কি তার সংবাদ রাখতাম? মনে হচ্ছিল, কিসের একটা আবেগ যেন আমার চেতনার দ্বারদেশে এসে মাথা কুটে মরছে! সেই আবেগই হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল আমার কণ্ঠে—আমার বড় ভয় করছে!

ও বুঝি আরও বিস্মিত হলো, বললে—কেন?

বললাম—এখানে তুমি আনলে কেন?

একটু হেসে বললে—সে ত আগেই বলেছি। একটা ব্যাপার আমার জানা দরকার ছিল।

—কী?

বললে—যতোই সংযমী হও, রক্তমাংসের দাবীকে তুমি পরিহার করো কী করে?

—অরু!

কিন্তু না, কণ্ঠে কিছুতেই ফুটে উঠল না তিরস্কার, যা জাগল, তা বিস্ময়—মাত্র অত্যুগ্র বিস্ময়!

বাঁকা একটু হাসল অরু, বললে—ওদের ডেকে নিয়ে আসি। একটুক্ষণ একা থাক তুমি। বিশ্রাম কর।

চলে গেল। এবং কতক্ষণের জন্য গেল? ক দণ্ড, ক পল, ক অনুপল কেটে গেল ওদের ফিরে আসার মধ্যে? লতা যখন আমার অতি কাছে এসে ডেকে উঠল, 'দিদি'—তখনই যেন ফিরে পেলাম সম্বিৎ।

ওর পিছনে অরুকেও দেখলাম, জগদীশকেও দেখলাম। বললাম—তোরা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলি কেন তখন?

লতা একটু যেন অপ্রতিভ হলো মনে হলো, তারপর বললে—তোমার লোকটাকেই জিজ্ঞাসা করো না কেন?

জগদীশ এতক্ষণে এগিয়ে এসেছে। কী ভেবে সে বলল—না দিদি, ভালো।

—কী ভালো?

থেমে-থেমে বললে—যা দেখে এলাম। মন্দির।

লতা হঠাৎ একটু কর্তৃত্বের সুরে ওকে বললে—বোঝা গেছে। এখন যাও দেখি অরিন্দমবাবুর কাছে, ঐ যে গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে কী বলছেন যেন! খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়, সেটা দেখ গিয়ে।

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল জগদীশ। ওর অপসৃয়মান গতিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম—তাড়ালি ত?

আমার পাশ ঘেঁসে বসে পড়ে লতা বললে—না হলে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা হতো কী করে?

একটু অবাক হয়েই বললাম—কী কথা? তোরও যেমন কাণ্ড!

চোখ দুটো হঠাৎ ওর ছলছল করে এলো, বললে—দিদিগো, আমি পালাচ্ছি।

—মানে!

বললে—খাওয়া দাওয়ার পরেই ছুট্ দেবো। গাড়িটা আমাদের সাতনায় পৌছে দিয়েই ফিরে আসবে। ওখান থেকে ট্রেন ধরে আমরা চলে যাবো।

ও বলে যাচ্ছে, আর ভিতরটা যেন আমার শিরশির করে উঠছে কী এক অদ্ভুত, অজানা আতঙ্কে। বললাম—এ আবার কী! এসেছি এক সঙ্গে, যাবোও এক সঙ্গে।

—না! লতা আমার দুটো হাত ধরে ফেললে, বললে—আমাকে বাঁচতে দাও দিদি।

বিস্ময় আরও ঘনীভূত হলো, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলাম—কী বলছিস তুই?

কেমন যেন কান্নাভরা কণ্ঠে বললে—তোমাদের দুজনকে রেখে যদি ওকে নিয়ে চলে যেতে পারি, তাহলেই মঙ্গল আমার পক্ষে। নইলে, আমি বুঝি নিজের অগ্নিদাহে নিজেই পুড়ে মরে যাবো। তোমাকে দিদি বলেছি, হয়ত তোমারও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবো! এ কী পরিবেশ দিদি! যেন চারিদিক থেকে কী একটা আবেশ এসে পশুর মতো পিষে মেরে ফেলতে চায়!

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। নিষ্প্রাণ ছায়াছবির মতো দেখতে পাচ্ছি, অরু আর জগদীশ গাড়িতে উঠে কোথায় বুঝি চলে গেল! হয়ত খাওয়ার ব্যবস্থারই তদারকে।

ওদের গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই লতা বললে—কী আছে দিদি ওর মধ্যে, বলতে পারো? এমন চুম্বকের মতো দেহটাকে টেনে নিতে চায় কেন?

অস্ফুটকণ্ঠে বললাম—দেহ!

—হ্যাঁ! লতা বললে—তুমি আমায় যা খুশি ভাবতে পারো। তোমাকেই আমি বলছি, শীগগির—

একটু থেমে, নিজের বুকের ওপর হাতটা রেখে বলে উঠল—শীগগির এই পাপকে যদি এখান থেকে বিদায় না করো, ত, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে!

এখনো চুপ করে আছি দেখে, ও বলে উঠল—শুনতে পাচ্ছ? আমার স্বামী-পুত্র সব ভেসে যাবে? আমি সর্বনাশী হয়ে উঠবো?

তাড়াতাড়ি ওকে দুহাত দিয়ে ধ'রে বলে উঠলাম—তুই কি পাগল হয়ে গেলি, লতা!

দুঃখ-করা কান্নায় ভেঙে পড়ল লতা, বললে—আমাকে শাস্তি দাও তোমরা, আমাকে মারো। বলতে বলতে হঠাৎ মুখ তুলে, অশ্রুপ্লাবিত দুটো চোখ আমার ওপর স্থাপিত করে বলে উঠল—আমার ইচ্ছা করে কী জানো? কেউ আমাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধুক। বেঁধে খুব করে প্রহার করুক আমাকে বেত দিয়ে! যন্ত্রণায় আমার সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে উঠুক, কেটে গিয়ে রক্ত ঝরুক, তবে বুঝি আমি শান্তি পাবো!

ওর অবস্থা দেখে, সত্যিকথা বলতে আমার চোখদুটি ভরে উঠল জলে, কী এক দুরন্ত স্নেহ তরঙ্গ তুলল আমার মনে, কী এক ব্যথাও বুঝি মথিত হতে লাগল আমার অন্তরে; ওকে শান্ত করতে গিয়ে বলে ফেললাম,—অমন করে না ক্ষমা, অমন করে না, শান্ত হ।

আশ্চর্য এই মেয়ে-মন। শান্ত ও হয়ে গেল মুহূর্তেই, ঈষৎ বিস্মিত দুটি চোখ আমার দিকে তুলে বললে—ক্ষমা কে?

একটু অপ্রতিভ হলাম প্রথমটায়। যে আসবার নয়, সে এসে পড়ে কেন এমনি করে, হঠাৎ?

উঠে দাঁড়িয়ে, নত হয়ে, ওর চোখদুটি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম—আমারই ছোট বোন। ঠিক তোর মতো।

—দেখতে?

—না, তোর বয়সী।

—ও!

ধীরে ধীরে বোধহয় স্থির হয়ে গেল ওর মন। ওর হাতটি টেনে নিয়ে, তার ওপর নিজের হাতখানা বুলিয়ে দিতে দিতে বলে উঠলাম—এ যায়গাটার একটা মাদকতা আছে, না রে?

আমার দিকে তাকালো, নিষ্প্রাণ দুটি চোখের দৃষ্টি। বললাম—শুনলি আমরা কথা? যাবি ত যা। আমি থাকব। থাকব আর একটি রাত। আর একটি দিন। সব ঘুরে ঘুরে দেখব। কাউকে চাই না সঙ্গী। অরুকেও নিয়ে যা তোদের সঙ্গে।

চোখদুটি যেন প্রাণ পেলো এতক্ষণে, বললে—একা থাকবে?

—থাকব।

বললে—দূর, তাই কি কখনো হয় নাকি?

—হলে ভালো হতো। বলে, একটু থেমে, একটু হেসে ওকে বললাম—কিন্তু, তা হবার নয়। অরু রাজী হবে না।

লতা মুখ নীচু করল, বলল—খুব ভালোবাসে তোমাকে।

—সন্দেহ আছে।

চমকে উঠে বলল—বলছ কী?

দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলাম—তুই আমার কাছে এমন করে মনটা খুলে দিলি, আমি দেবো না? আমার মনে হয়, ও কাউকে ভালবাসে না। সব ওর খেয়ালের সুতো দিয়ে বাঁধা, যে কোন মুহূর্তে সব সূত্র যেতে পারে ছিঁড়ে!

লতার নত মুখখানা আবার বুঝি অশ্রুপ্লাবিত হয়ে ওঠে! তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—কী, হচ্ছে কী?

মুখ তুলে ও বললে—তুমিও বুঝেছ!

বলে আমার একখানা হাত আঁকড়ে ধরে বলে উঠল—আমাকে ছেড়ে দাও দিদি, পালিয়ে যাই।

বললাম—কোথায় পালাবি, বাড়ী ফিরে গিয়েও কি পালিয়ে থাকতে পারবি?

বললে—প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে ছুঁয়ে, আর কখন সামনে আসব না ওর।

এবং সত্যিই। কারুর কথা শুনল না, কারুর অনুনয় মানল না, জগদীশ পর্যন্ত বললে। অরু বললে। আমি বললাম। বললাম, সত্যি যাচ্ছিস? তাহলে আমরাও যাই না কেন?

তারপরেই যেন জোর করে গাড়ী নিয়ে চলে গেল পাটনা। অরু বললে—বরং বাড়ীই চলে যাও গাড়ী নিয়ে। আমরা ট্রেণে যাবো।

তা তেমনি কঠোরভাবে কর্তৃত্বের সুরে বলে উঠল—না, গাড়ী ফিরে আসবে সাতনা থেকে।

অরু বললে—যদি আরও দুদিন থেকে যাই?

—গাড়ীও থাকবে।

—তোমার বাবা রাগ করবে না?

—সে ভার আমার।

তারপরে একসময় ছুটে চলে গেল গাড়ী। অরু অনেকক্ষণ ওদের সেই চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তা থাক। কিন্তু আমার বার বার মনে পড়তে লাগল, লতার সেই অদ্ভুত

উক্তি,—কেউ আমাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধুক। বেঁধে খুব করে প্রহার করুক আমাকে বেত দিয়ে। যন্ত্রনায় আমার সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে উঠুক, কেটে গিয়ে রক্ত ঝরুক, তবে বুঝি আমি শান্তি পাবো।

লতা ত নয়, ও যেন ক্ষমা! ভাবতে ভাবতে চোখ দুটি জ্বালা করে উঠতে চায়। ক্ষমা কেমন করে বেঁধে রেখেছে নিজেকে? আমি ত জানি তার মন। কিম্বা, মলয়কে পেয়ে তার সব বেদনা মুছে গেছে! বোধ হয়, তা-ও যায়। যদি না যেতো, সবাই যদি সব-কিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারত, তাহলে কেমন করে চলত বিশ্বসংসার? সময়। সময়ের বন্যা সব-কিছুর ওপরে পলিমাটি বিছিয়ে বিছিয়ে চলে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে কতো ঘাটের কতো স্মৃতি, কতো পায়ে-পায়ে চলার চিহ্ন!

—কী ভাবছ তুমি?

চমকে চেয়ে দেখি, অরু এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। বললে—চলো না, চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ি?

—চলো।

বললে—জ্বারডিন মিউজিয়ামটা কাল দেখা যাবে। চলো যাই পূর্ব অঞ্চলে। হেঁটেই চলো। আধ মাইল মাত্র।

তাই গেলাম। গ্রামের কাছেই। সরোবরের ধারে। সেই আসন্ন অপরাহ্নে নিনোরা তাল সরোবর ভারী চমৎকার লাগছিল। বহু লোক বেড়াচ্ছে এখানে। সেই বিদেশী ও বিদেশিনীরা। সেই মারাঠা ছাত্র-ছাত্রীরাও।

বললাম—এসো, বসি এখানে।

ও হাত ধরে টেনে বললে—না। আগে চলো মন্দিরে।

গেলাম। দেখলাম বহুক্ষণ ধরে, ঘুরে ঘুরে। ছটি মন্দির, তিনটি হিন্দু, তিনটি জৈন। কী সব নাম। আদিনাথ, ঘণ্টাই, ব্রহ্মা, বামন, পার্শ্বনাথ। কতো সুন্দর সুন্দর সব মূর্তি আছে এখানে উৎকর্ণ। প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্বেল ভুজবল্লরীর সামনে দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম বহুক্ষণ ধরে। কী অদ্ভুত, এবার ত ঘটল না কোনো চিত্তচাঞ্চল্য। ওর মুখের দিকে তাকালাম সকৌতুকে। ও-ও নির্বিকার। হাত ধরে টানলাম, বললাম—চলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

ছেলেমানুষটির মতো অনুনয়ের স্বরে বললে—আর একটু দেখি, কেমন?

ঈষৎ চটুলকণ্ঠে বলে উঠলাম—মন্দিরের স্থাপত্য দেখ, কিন্তু ওসব মূর্তি কী দেখবে? চলো। ও বললে—সামনের ঐ মূর্তিটি দেখ। মেয়েটি ডান পা-টি তুলে বাঁ-পায়ের হাঁটুর কাছে এনেছে, ডান হাতটি নামিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে ধরেছে ডান পায়ের আঙুল! আর, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি ঘুরিয়ে দিয়েছে একটু হেলিয়ে বাঁ-দিকে, বাঁ-হাতটি লীলায়িত ভঙ্গিমায় ওপরের দিকে দিয়েছে তুলে, দিয়ে, কনুয়ের কাছে ভেঙে, আঙুলগুলি রেখেছে বুকের ওপরে। নৃত্যলীলার এই অপরূপ ভঙ্গিমাটির কী তুলনা হয়! মূর্তিটি, সত্যি কথা বলতে কী, আমাকেও আকর্ষণ করেছিল কম নয়। মেয়েটি যেন জগৎসংসারের সব-কিছু ভুলে, বাস্তবের সব দাবীকে অস্বীকার ক'রে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বর্গলোকে তার অন্তরকে প্রেরণ করেছে! তার অনাবৃত সুগভীর নাভিমূল, তার সুগঠিত কুচযুগ—এই দৈহিক শোভাকে অতিক্রম করে, তার অন্তরের ভাব-রাজাই সৃষ্টি করেছে এক অনির্বচনীয় সুষমা! হঠাৎ আমার মনে হলো, সার্থক আমার খাজুরাহোতে আসা, এত মন্দির ত দেখলাম এখানে, এত মূর্তিও ত দেখলাম, কিন্তু আদিনাথ মন্দিরের এই নৃত্যপরায়ণাকে কখনো ভুলতে পারব না আমি! দেহ-সৌন্দর্যকে

প্রকটিত করে ও বুঝি দেহকেই গেছে অতিক্রম করে! যেন বলতে চেয়েছে—তুচ্ছ এই দেহ, প্রকৃতি তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই সৌন্দর্যকে করেছে সৃষ্টি, তাকে নিয়ে যদৃচ্ছ ব্যবহার করুক প্রকৃতি, —কিন্তু আমি, আমার মনোজগৎ, আমার আত্মা? তাকে স্পর্শ করবার মতো পুরুষ কই? পাই নি, একটিও পাইনি, তাই আজও উর্দ্ধলোকের দিকে তাকিয়ে আছি অসীম-অনন্ত তৃষ্ণায়! কতো পল-অনুপল-প্রহর-মাস-বছর গেছে কেটে, এক এক করে একটি হাজার বছর,—তবু আমি পাইনি তাকে! দেহের দীপ্তি কখন নিভে গেছে, শীতল হয়ে গেছি আমি, পাষাণ হয়ে গেছি, কঠিন প্রস্তর-স্তূপ! দেহের যেখানে খুশী তোমরা স্পর্শ করো লোভাতুরের দল, কোনো স্পন্দনই জাগবে না আমার অন্তরলোকে, যতক্ষণ না পাই তার দর্শন! তাকে ছোঁয়া নয়, তাকে দেখামাত্রই জেগে উঠব আমি, হিল্লোল উঠবে আমার অঙ্গে অঙ্গে! দেহ-মন-আত্মার অনুভূতি এক হয়ে গিয়ে যে প্রচণ্ড এবং মহত্তর অনুভূতির মধ্যে আমি জেগে উঠব, তার নাম—প্রেম! একটি নয়, দুটি নয়, একশো নয়, দুশো নয়, সহস্র বৎসর ধরে অপেক্ষা করে আছি, প্রেম নেই।

—সুন্দর, না?

আমার তন্ময়তা লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ এ প্রশ্ন করে থাকবে অরু। চমকটা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু যা মুখে বললাম, তা আমার মনের কথা নয়, বললাম—ছাই। এসো দেখি এখন? ভর সন্ধ্যেবেলা এতো নির্জন যায়গায় থাকাটা ভালো নয়!

বলে, আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে চলা শুরু করতেই ও এলো পিছনে পিছনে। বললে, তা বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ যে মেয়েটি গায়ে আলতা পড়ছে, তাকে দেখবে না? দেখবে না সেই নর্তকী মেয়েটিকে, যে ডান পাটি উঠিয়ে, তাতে বেঁধে নিচ্ছে তার খসে পড়া নূপুরটি।

—যথেষ্ট দেখেছি, এখন এসো দেখি আমার সঙ্গে?

আর কোন কথা বলল না অরু, বাধ্য ছেলেটির মতো চলতে লাগল আমার পাশাপাশি। নিনোরা তাল সরোবর হয়ে যখন ফেরার পথে পা ফেলেছি, ও বললে—টঙা করবো একটা?

—না, হাঁটতে খারাপ লাগছে তোমার?

—না।

—তবে চলো।

শুরু হলো চলা। আমাদের দেখাদেখি সেই সাহেব মেমদের মধ্য থেকে দুজন যেন কী ভেবে হাঁটা শুরু করেছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে, হেডলাইট জ্বালিয়ে বাস্ চলে গেল, চলে গেল মারাঠি ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একের পর এক টঙাগুলি। সাহেবদের দলও গেল টঙা করে, শুধু আমাদের পিছনের দুটিকে বাদ দিয়ে। আমার সঙ্গে আজ সকালে পরিচয় করেছিল যে শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েটি, সে দেখি একটা টঙা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে হঠাৎ হাতটা নেড়ে উঠল, হাসি হাসি মুখে বললে—হ্যালো!

—হ্যালো।

বেরিয়ে গেল টঙা। পিছনের দুটি মানুষ যে ঘন হয়ে চলতে-চলতে ফিস ফিস করে কথা বলছে, মাঝে মাঝে কেবলই যে একটু-একটু হেসে উঠছে, তাও আমার অনুভূতি বুঝি পরিহার করে চলতে চায় না।

অরু হঠাৎ বলে উঠল—কী আপদ!

সকৌতুকে তাকালাম ওর মুখের দিকে, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম—কী হলো?

বললে—পিছনের দুজন।

—কী করল ওরা?

—না ঝকলেই ভালো হতো।

—কেন?

অরু একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললে—শুধু দুজনে চলার যে থ্রিল, তা থেকে ওরা বঞ্চিত করলে ত?

অল্প একটু হাসলাম, বললাম—বেশ হয়েছে। কেমন মজা।

ও মুখ ভার করে বললে—তুমি ত মজা দেখতেই আছো।

ওর হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম—এসো, ওদের মতোই চলি আমরা।

বলামাত্রই হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল মুহূর্তের জন্য। ও যদি সাংঘাতিক কিছু বলে বসে এর উত্তরে? পিছনে মুখ ফিরিয়ে এক সময় দেখেছিলাম, ওরা পরস্পরের কোমরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, নির্বিবাদে হেঁটে চলেছে। অরু যদি আমার কথার উত্তরে হাতখানা জড়িয়ে দেয় আমার কোমরে? কথাটা মনে আসতেই শিরশির করে উঠল সারা শরীর। অমনি করলাম কী, ওর হাতখানা ছেড়ে দিলাম চট্ করে। ওই ছেড়ে দেওয়াটা ও যে লক্ষ্য না করেছে এমন নয়, কিন্তু কিছু বলল না। মুখ ফিরিয়ে আমাকে একটিবারের জন্য দেখে নিয়ে, সামনের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতোই চলতে লাগল অরু।

কিছুক্ষণ পরে, অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণ পরে, আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম সর্বপ্রথম, বললাম—অমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

সংক্ষেপে বললে—না। স্থাপত্য-শিল্পের কথা ভাবছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম—তাই ভাবো।

অরু শুনল কি শুনল না, কে জানে! নীরব হয়ে যেমন সে চলছিল, তেমনি চলতে লাগল। আলো-আঁধারি পথের ওপরে মাঝে মাঝে আমাদের দুটি ছায়া পড়ছে! সে ছায়া যেন কখনো-কখনো জড়াজড়ি করে ধরছে পরস্পরকে, কখনো ছেড়ে দিচ্ছে, বলে মনে হতে লাগল।

এলাম ফিরে। রক্ষকমশাই বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার সঙ্গে কী-যেন সব কথা বলতে লাগল অরু, বোধহয় খাওয়া-দাওয়ার কথাই হবে। আমি পাশ কাটিয়ে চলে এলাম আমাদের ঘরের সামনে। দরজায় ঝুলছে তালা। সামনের খালি বেতের চেয়ারগুলির একটাতে বসে পড়লাম ধপ করে। নিজেকে হেলানো চেয়ারটায় সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত আরাম পেলাম মনে। মনে হলো, সর্বাঙ্গ শিথিল করে দিয়ে এমনি করে এখানে পড়ে থাকি,—চুপচাপ—সারারাত।

অরু এলো একটু পরেই। আমাকে লক্ষ্য করল। ঘর খুলল। আলো জ্বালালো। তারপরে, নিভিয়েও দিলো। এলো আমার কাছে। বললে—চায়ের কথা বলে দিলাম।

সেইভাবেই আধশোয়া অবস্থাতেই বলে উঠলাম—ভালো। চায়ের কাপে ঝড় তোলা যাবে।

—কীসের ঝড়?

—তর্কের।

—কীসের তর্ক?

বললাম—রীতিমত ডিবেট করা যাক। তুমি নাও লতার পক্ষ, আমি ওর বিপক্ষে। ওর চলে যাওয়াটা

ঠিক হয়েছে কি না, এ নিয়েই শুরু হবে তর্কযুদ্ধ। তুমি বলবে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আমি বলব—না, ঠিক হয়নি। মধ্যেপথে ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—কিন্তু, এর মীমাংসা ত হবে না। 'হ্যাঁ' যেমন অনেকের ক্ষেত্রে চট্ করে 'না' হয় না, 'না'-ও অনেকের ক্ষেত্রে চট্ করে 'হ্যাঁ' হয় না।

ধীরে ধীরে বসে পড়ল আমার পাশের চেয়ারে, কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বললে—আমি কিন্তু তা ভাবছি না কৃষ্ণা। ঠিক এই মুহূর্তে, কতোগুলি চিন্তা এসে আমাকে মধুমক্ষিকার মতো ঘিরে ধরেছে।

হেসে বললাম—উপমায় 'মধু' আছে বলে আশ্বস্ত হলাম, নইলে মাছির ভনভনানি কে শুনতে চায় বলো?

—ঠিক বলেছ! ও যেন আরও উৎসাহিত বোধ করল, বললে—ঐ সব স্থাপত্যের কথাই আমি বলছি। জানো কী মনে হচ্ছে? মানুষের এক একটি ভঙ্গিমা এক এক সময় যে আর্টের সৃষ্টি করে, তার তুলনা নেই! সে-সম্বন্ধে চোখ আরও খুলে যায় ওদের পাষাণী মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা দেখে।

বলে উঠলাম—আহা, কী এমন ভঙ্গিমা! কেউ পায়ে নূপুর পরছে, কেউ আলতা পরছে, এ সব কখনো দেখ নি? মিশেছ ত অনেক মেয়ের সঙ্গে।

কেমন যেন অবাক-হওয়া, অথচ খুশী-খুশী চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি একটু ঝুঁকে প'ড়ে, ওর সার্টের একটা বোতামে হাত রেখে, সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে উঠলাম—না হয় আমি একদিন পায়ে আলতা পরবো, তুমি দেখো।

ও বললো কী, আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল—আজই, কেমন?

ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বলে উঠলাম—দূর পাগল!

ও একটুক্ষণের জন্য থেমে রইল বটে, কিন্তু চা-পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর, মনে হল্লো, ওকে বুঝি বিচিত্র এক মত্ততায় পেয়ে বসেছে! বারান্দার আলো নিভিয়ে দিলো, সাহেবদের দিকেও নিভে গেল আলো। আমাদের দেখাদেখি। আমাদের দেখাদেখি ওদের ঘরের সামনে-রাখা বেতের চেয়ারেও বসেছে দুটি তরুণ-তরুণী, পাশাপাশি, অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কী ওরা ফিসফিস ক'রে আলাপ করে চলেছে কে জানে! সেই তরুণ আর তরুণী, যারা নির্জন পথ দিয়ে হেঁটে আসছিল আমাদের পিছনে-পিছনে। কথা বোঝা যায় না, কিন্তু এটুকু বোঝা যায়, তরুণ ইংরেজটির কণ্ঠস্বর বেশ মোটা, তার ফিসফিস করা কথার উত্তরে মাঝে মাঝে হেসে উঠছে তরুণী মেয়েটি।

সেদিকে চোখ নেই অরুর, সে অজস্র কথার মালা গেঁথে চলতে লাগল একের পর এক। এই বিচিত্র পরিবেশ তার মনে বুঝি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে, আমি যখন পাশে আছি, তখন তার সত্তা জ্বলে উঠেছে বিপুল উৎসাহে, একটা কিছু বিরাট, একটা কিছু মহৎ সে করে যাবেই। এইভাবে কতো কথা যে ও বলে যেতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই, আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী ও বলছে কে জানে, আমার শুধু মনে পড়ে গেল লতার কথাটা। কী এক শক্তি আছে ওর মধ্যে, যা নাকি চুম্বকের মতো টানে। আজ, ঠিক এই মুহূর্তে, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আছে। আছে ওর মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি, যার আকর্ষণে বুঝি যে কোন মেয়েই পারে ওর পায়ে দিতে আত্মাহুতি!

কাছ ঘেঁসেই ত বসেছিল ও, আমি করলাম কী, আমার একটা আঙুল চেপে ধরলাম ওর ঠোঁটের ওপর, কথা ওর বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

যে অসাধারণ রাত্রিটির কাহিনী আমি বলতে যাচ্ছি, তার সম্বন্ধে কৃপায়ণ বোধ হয় সম্ভব নয়। যতই বলি না কেন, যে-ভাবেই বলি না কেন, বোধ হয় সত্যের সে অপূর্ব বিকাশের পরিচিতি আমি দিতে পারব না কিছুতেই।

ঘরে গেলাম আমরা। লতা চলে যাবার সময় বোধ হয় ব্যাপারটা দেখেও দেখি নি, লক্ষ্য করেও করি নি। তা না হলে এতক্ষণ পরে ঘরে এসে যা দেখলাম, তা দেখে অতোটা চমকে উঠতে পারতাম না। দেখি, সেই দুটি খাটে, বিছানা দুটি ঠিক পড়ে আছে। এবং আরও পরিপাটি করে বিছিয়ে দেওয়া নির্ভাজ চাদর।

বুঝলাম, ইচ্ছা করে এ সব রেখে গেছে লতা। সঙ্গে সঙ্গে মন যেন ফিরে এসে দাঁড়াল সুকঠিন বাস্তব ভূমির ওপরে। চারিদিক দেখে নিয়ে একটু অবাক হয়েই বলে উঠলাম—মশারী কই?

অরু বললে—নিয়ে গেছে।

—তুমি দেখেছ নিতে?

—হ্যাঁ, বাড়তি বালিশ মশারী, সব নিয়ে গেছে। বললে শীতকাল, মশা লাগবে না। এ আড়াল মিছামিছি!

ধক্ করে উঠল ভিতরটা কিন্তু সে ভাব সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম—সাতনা থেকে গাড়ি ত ঘুরে আসবার কথা। এখনো এলো না যে?

—আসবে। আমাদের সঙ্গে ড্রাইভারের খাবারেরও অর্ডার দিয়ে রেখেছি কেয়ারটেকারকে।

বলেই, ভঙ্গিতে একটা চাঞ্চল্য এনে ও বলে উঠল—তুমি বরং বসো, আমি একবার সব দেখেটেখে আসি।

একটুক্ষণ পরেই ফিরে এলো অরু। আমি ততক্ষণে মাঝের জানালাটা খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি লোহার শিকগুলি শক্ত করে ধরে। মনটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ, সেখানে কেউ উঁকি দিচ্ছে না, এমন কি যার কথা অনুক্ষণ চিন্তা করি সেই ক্ষমাও না। মাথটাও কেমন যেন হালকা, কিছু ভাবছিও না অথচ ভাবছি, সব মিলিয়ে যেন মোহগ্রস্ত, সম্মোহিত হয়ে গেছি। ও বললে, ড্রাইভার কখন এসে গেছে, আমরা টেরও পাইনি। গিয়ে দেখি গাড়ির সীটে পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে রাম খিলাওন।

নির্বোধের মত ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কয়েক মুহূর্ত। ও বললে—কী দেখছ?

বললাম—লতারা ট্রেন ধরতে পেরেছে ঠিকমতো?

—হ্যাঁ।

—যাক। এতক্ষণে ডিংরী পৌছে গেছে, কী বলো?

—তা না হলেও, মানিকপুর অবশ্যই পৌছে গেছে।

চুপ করে সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখ ফেরালাম জানালার দিকে। লঘু-মেঘ ভেসে যাওয়া আকাশ।

ও বললে—খাওয়া দাওয়া ব্যাপারটা এখন সেরে নিলে কেমন হয়?

—খিদে পেয়েছে বুঝি?

—না, তা ঠিক নয়, তবে কেয়ারটেকারকে ফ্রী করে দিতে পারাই ভালো।

—বেশ।

শেষ হলো এ পর্বও। ও বললে—আমি যদি বাইরে শুই, কেমন হয়?

—ছেলেমানুষী করো না।

মুখে বললাম বটে, কিন্তু ঘরের খিলটা নিজের হাতে তুলে দিতে দিতে হঠাৎ মনে হলো, চোখ

দুটো জ্বালা করে উঠছে, চোখের পাতা উঠছে ভিজে। মনের দর্পনে আমার মায়ের সেই ক্ষমাশীল হাসি হাসি মুখখানা মুহূর্তের মধ্যে জেগে আবার মিলিয়ে গেল।

ও বললে—ঠাণ্ডা কেমন, দেখেছ? ভালো করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো, সারাটি দিন গেছে ঘোরাঘুরির ওপরে, নিশ্চয়ই তুমি ক্লান্ত?

জানিনা নেশাগ্রস্তের মতো কোন্ খাটটার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, কালকে যেটাতে শুয়েছিলাম সেটা? না, যেটাতে ওরা শুয়েছিল, সেটা?

খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। ও যখন কাছে এসেছে সরে, অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলাম, কাল ভোরেই ফিরে যাবো কিন্তু।

—কালই? এখনো দক্ষিণ অঞ্চলটা দেখা হয়নি।

—না হোক। তবু চলো।

—বেশ।

বলে, সরে গেল কাছ থেকে। সংলগ্ন যে ছোট্ট একটা স্নানের ঘর আছে, সে কথাটা বলবার অবকাশ এতক্ষণ পাইনি, ও ওর তোয়ালেটা হাতে নিয়ে চলে গেল স্নানের ঘরের আড়ালে। মুখে-চোখে-মাথায় বোধহয় জল ঢেলে ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরে। ভালো করে মোছেনি মাথা, এখান-ওখান থেকে ধারা নেমে এসেছে কপালে-গালে।

বললাম—কাছে এসো। তোয়ালেটা দাও।

দিলো। তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মাথাটা মুছিয়ে দিলাম ওর, যেমন দিতাম আগে আগে বিমলকে। বললাম—এখন মাথা ধুলে কেন?

বললে—বড়ো আরাম-হলো।

—দাঁড়াও, চিরুনীটা দিয়ে ভালো করে আঁচড়ে দিই।

বিমলকে অমনু কতো দিয়েছি, তখন ও কলেজে পড়ে, বেশ বড়োই হয়েছে, তবু চুলটা এলোমেলো করে রাখাই ছিল ওর অভ্যাস। শাসন করতাম। বলতাম—এদিকে আয়। আঁচড়ে দিই।

লক্ষ্মী ছেলের মতো কাছে এসে দাঁড়াতো। ও-ও দাঁড়ালো। তারপরে, আমার কাজ শেষ হবার পর, দুটি মুগ্ধ চোখ তুলে তাকালো আমার মুখের দিকে। বললে—আরেকটা সাধ আমার মেটাবে?

—কী?

—খোঁপাটা খুলে ফেলবে তুমি? সেই একদিন দেখেছিলাম বাড়িতে স্নান সেরে বেরিয়ে আসছ, কী অজস্র অগাধ কেশকলাপ তোমার!

লজ্জায় মুখখানা নত করেছি ততক্ষণে। ও একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বললে—

—মেটাবে না? মেটাবে না আমার সাধ? আর কিছু না। আর কিছু চাই না আমি। বিশ্বাস করো। ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি অন্যদিকে, কিন্তু মনে হলো, সমস্ত শরীর জুড়ে যেন এক অশ্রুত সঙ্গীত শুরু হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি তার আলাপ। আলাপ শেষ হবার পর শোনা যাবে তার স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আর আভোগ। এবং হয়ত বা রেশও থাকবে তারপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

ধীরে ধীরে পিছনে হাত নিয়ে কাঁটা উঠিয়ে-উঠিয়ে শিথিল করে দিলাম বেণী। ছেলেরা

আমাদের বেণীকে সাপের সঙ্গে তুলনা করে। সেই কালো সাপ-কে আনলাম বাঁ-কাঁধের পাশ দিয়ে বুকের ওপরে। আমার বাঁদিকেই দাঁড়িয়ে আছে অরু, এবং বেশ বুঝতে পারছি, ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক অপরূপ মুগ্ধতা। অসিতাই বোধ হয় কথাটা বলতো বেশী, বলতো—বড়দি পেয়েছে মায়ের চুল। সত্যিই তাই, আমার মায়ের কেশকলাপ বাস্তবিকই দেখবার মতো। এই বয়সেও মায়ের যা রয়ে গেছে, তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। নরম রেশমের মতো কেশগুচ্ছ একটু একটু কোঁকড়ানো, ঘন এবং দীর্ঘ।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমার কুন্তলজালকে কখন বুঝি মুক্তি দিয়েছি বেণীবন্ধ থেকে, কিছু ছড়িয়ে পড়েছে আমার দুটি পাশে, বাহুমূলে, আর সব ঢেউয়ের মতো গিয়ে পড়েছে আমার কটিদেশ ছাপিয়ে, ব্যাপ্ত হয়ে। মাঝে মাঝে মানুষের শরীরও যে কতো স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ পেলাম—সেই মুহূর্তে—নিজেরই দেহতটে। বাঁধ-ভাঙা উন্মুক্ত কেশগুচ্ছের প্রান্তগুলি যেন কোনো-এক অজ্ঞাত পুরুষের অঙ্গুলি-স্পর্শের মতো আমার শাড়ী-সায়া ভেদ করে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারংবার! শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ। বাঁ-দিকে চট্ করে ফিরে দাঁড়াতেই একজনের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে যেন সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাঁ-হাত দিয়ে একগুচ্ছ কেশ টেনে এনেছি বুকের ওপর, সেই অবস্থায় তাকিয়ে আছি সেই দুটি চোখের দিকে, এক দৃষ্টে। মনে হচ্ছে, খাজুরাহোর সব মন্দিরের সব মূর্তিগুলি যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে গেছে আমার মধ্যে! পায়ে আলতা পরা শেষ হয়েছে পাষাণ-সুন্দরীর, নূপুর বাঁধাও সারা হয়েছে লাস্যময়ী নটিনীর। আর, দুটি মৃণাল বাহু দিয়ে দয়িতের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে ধরেছে তৃষ্ণার্তের মতো যে নারী-মূর্তিটি,—আজ সহস্র বৎসর পরে সে-ও বুঝি ফিরে পেয়েছে প্রাণ!

যা বলেছিলাম, তা স্মরণ করলে আজও অদ্ভুত লাগে, একেবারেই সঙ্গতিহীন—অসংলগ্ন কথা। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওর বুকে আমার গালের ডান দিকটা ঘষতে ঘষতে বার বার বলছিলাম অস্ফুট কণ্ঠে—পারি না—আর পারি না—মুক্তি দাও—মুক্তি দাও তুমি!

অনুভব করেছিলাম, আমার সেই কেশবন্যার ওপরে ওর সস্নেহ অঙ্গুলির হাল্কা-তরী-বেয়ে-যাওয়া! অনুভব করেছিলাম, আমার বাহুর ওপরে দুটি বলিষ্ঠ বাহুর আশ্লেষ! তারপরে অনুভব করেছিলাম, কখন ওর কাঁধের ওপরে লতার মতো দুটি হাত জড়িয়ে, নিবিড় আগ্রহে মুখখানি এগিয়ে দিয়েছি আমি। পুরুষের একটি হাত আমার কেশকলাপের কাছটিতে ছুঁয়ে আছে, আর একটি হাত কটিদেশে। আলিঙ্গনাবদ্ধ ঠিক সেই পাষাণ কুমার-কুমারীর মতো! ওদের উদ্ভাত যে চুম্বন সহস্র বৎসর পূর্বে সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ বুঝি তা এতদিনে পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে! মুহূর্তে বিস্মরণ হয়ে গেল আমার সব, কে ও, কে আমি, জানি না। কী ছিল ও জানি না—কী ছিলাম আমি জানি না। আমার বিশুষ্ক অধর যেন মুহূর্তে বিদ্যুৎ তরঙ্গে ভরে গেল! কিন্তু, তখনো বাকী ছিল বজ্রপতন, তখনো বাকী ছিল ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের হাহাকার! আমার উপহারের প্রতিদান দিতে পুরুষ যখন আমাকে টেনে নিয়েছে নিবিড় আশ্লেষে, ভরিয়ে দিয়েছে প্রগাঢ় চুম্বনে,—হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি বজ্রাহত হয়ে গেছি! বারবার বিদ্যুৎ-স্পর্শ আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে ঠোঁটে, গালে, কপালে, আর আমি অস্ফুটকণ্ঠে বলে চলেছি না-না-আর না-আর না।

বলছি, কিন্তু ছাড়িয়ে নিচ্ছি না ত নিজেকে পুরুষের বাহু-বেষ্টনি থেকে। যেন আমার জীবনের সব স্পন্দন—জীবনের সব গতি, সব আকুতি,—মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছি আমি। সেই একক সূক্ষ্ম বসন-পরিহিতা পাষাণ নর্তকীটির মতো। ডান পাটী তুলে বাঁ-পায়ের হাঁটুর কাছে এনেছে, ডান হাতটা নামিয়ে

দিয়ে, আঙুল দিয়ে ধরেছে ডান পায়ের আঙুল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি ঘুরিয়ে দিয়েছে একটু হেলিয়ে বাঁ-দিকে, বাঁ-হাতটি লীলায়িত ভঙ্গিমায় ওপরে দিয়েছে তুলে; দিয়ে, কনুয়ের কাছে ভেঙে আঙুলগুলো রেখেছে বুকের ওপর! যেন দেহ-সৌন্দর্যকে প্রকটিত করে, দেহকেই গেছে অতিক্রম করে। যেন বলতে চেয়েছে, তুচ্ছ এই দেহ, প্রকৃতি তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই সৌন্দর্যকে করেছে সৃষ্টি, তাকে নিয়ে যদৃচ্ছা ব্যবহার করুক প্রকৃতি,—কিন্তু আমি, আমার মনোজগৎ, আমার আত্মা? দেহের দীপ্তি নিভে গেছে, শীতল হয়ে গেছি, পাষাণ হয়ে গেছি, দেহের যেখানে খুশী তোমরা স্পর্শ করো লোভাতুরের দল, কোন স্পন্দনই জাগবে না আমার অন্তরলোকে।

যেন আমাকে দু'হাত ধ'রে হঠাৎ এই সময় ছুঁড়ে ফেলে দিলো পুরুষ, খাটের প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে যখন লুটিয়ে পড়লাম বিছানায়, তখন কোথাও আমার আঘাত লেগেছে কি না, তা-ও বোঝবার মত শক্তি আমার ছিল না। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিয়েছে অরু, এমন কি মাথার কাছে জানালাটা পর্যন্ত দিয়েছে বন্ধ করে, যাতে না দেরী-করা-চাঁদের আলো লুটিয়ে এসে পড়তে পারে আমার বিছানায়, কিম্বা মেঝের ওপর।

দেহটাকে টেনে বিছানায় এনে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছি উপুড় হয়ে। ওকে ত দেখানো যাবে না এই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা! এত কান্না! এত কান্নাও ছিল আমার মধ্যে জমে? দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে এত করে চেষ্টা করেছি উচ্ছ্বাস রোধ করতে, তবু বুঝি স্বর ফুটে উঠবে কণ্ঠে, অরু বুঝি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে—আমি কাঁদছি।

এরই নাম—চুম্বন! এরই নাম পুরুষের আশ্লেষ! কেমন একটা মত্ততা আসে, নেশাও জাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অজানা আতঙ্কে বুক কাঁপতে থাকে কেন? মায়ের হাসি-হাসি মুখখানা বারবার মনে পড়তে থাকে। মনে পড়তে থাকে লতার মুখ। মনে পড়তে থাকে আরও একজনের মুখ, সে—ক্ষমা।

কী এক তীক্ষ্ণ যাতনা যেন আমার সর্বশরীরকে অকস্মাৎ অসাড় করে দিতে চাইল। কান্না যেন চাইল আরও দ্বিগুণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে। যেন বলতে চাইল—কী করলে—কী করলে তুমি আমার?

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চাইলাম যখন অন্য খাটটির দিকে, দেখি নিস্পন্দের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে অরু। চোখের নীরব অশ্রু ধীরে ধীরে থেমে গেল। কানের কাছে বাঁশীর বেসুরো একটা আওয়াজ এতক্ষণ ধরে যে ঝি-ঝির মতো বাজছিল, সেও স্তব্ধ হয়ে গেল আস্তে আস্তে। পাশ ফিরলাম এক সময় অরুর দিকে। সারা অঙ্গ যেন শিথিলতায় ভেঙে গেল। তারপর, আশ্চর্য মানুষের মন, সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্য দিয়ে যেন বাজতে লাগল এক অশ্রুত রাগিনী। কী এক সর্বনাশের প্রত্যাশায় বুঝি উন্মুখ হয়ে রইল চিত্ত। কিন্তু এলো না ত লোভাতুরের দল, দেহের যেখানে খুশী স্পর্শ করল না ত তারা!

সেই যে আমাকে ছুঁড়ে দিলো আমার খাটের দিকে, আর সেই যে অন্ধকার করে দিল ঘর, তারপরে, আর ত সাড়া দিল না অরু, আর ত এল না কাছে?

কতক্ষণ, কতো দণ্ড, কতো প্রহর এমন করে একক শয্যায় কেটে গেল কে জানে, হঠাৎ মনে হলো আমি বিছানায় শুয়ে শুধুই ছটফট করে চলেছি। যেন পাষাণ-সুন্দরীদের হাজার বছরের তৃষ্ণা অকস্মাৎ আমার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে চায়। যেন বলতে চায়—মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।...

এই যে মেয়েটা অন্ধকারে আত্মগোপন করে শুয়ে আছে যার নাম কৃষ্ণা,—তার মুক্তি-প্রার্থনায় একেবারে

বিপরীত সুর জেগে উঠল ঐ একই 'মুক্তি' শব্দের মধ্য দিয়ে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে সে বুঝি মুক্তি চাইছে ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্যে। বিদেহী চাইছে দেহের বন্ধনের মধ্যে মুক্তি!

একবার মনে হলো, আমি চীৎকার করে ডেকে উঠি—অরু?

যদি ঘুমিয়ে থাকে, ঘুম ভেঙে যাক। আর তারপর? তারপরে মনে পড়ে গেল লতার সেই আশ্চর্য কথা: আমার কী ইচ্ছা করে জানো? কেউ আমাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বাঁধুক। বেঁধে খুব করে প্রহার করুক আমাকে বেত দিয়ে। যন্ত্রনায় আমার সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে উঠুক, কেটে গিয়ে রক্ত ঝরুক, তবে বুঝি আমি শান্তি পাবো!

মনে হলো, না হয় আসুক সেই দেবপ্রয়াগের মানুষটি, এসে সপাং সপাং করে চাবুক মারুক আমার সর্বাঙ্গে। ফেটে যাক আমার কপাল, আমার ঠোঁট, আমার গাল, আমার চিবুক! সকালে উঠে আর আমাকে চিনতে পারবে না কেউ। কদাকার এক রাক্ষসীতে পরিণত হয়েছি আমি!

তবু, সময় পার হয়ে যায়, তবু ঘুম আসে, তবু রাত কাটে। ধড়ফড় করে যখন উঠে বসেছি বিছানায়, তখন বোধ হয় ভোর হয়ে গেছে। ঠাণ্ডার দিন, তবু মনে হলো, অসহ্য গরম। উঠে, স্নানের ঘরে গিয়ে স্নান সেরে নিলে কেমন হয়?

উঠলাম। টুকিটাকি যা পনবার, সন্তর্পণে তা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু, বাইরেরটায় যাবো, না, ভিতরেরটায়? ভিতরে গেলে জলের শব্দে অরুর যদি ঘুম ভেঙে যায়? হাসি এলো ঠোঁটের কোণে, ভাঙলই বা ঘুম?

ভিতরের ঘরেরই দরজা খুললাম, বন্ধ করলাম খুব সন্তর্পণে। চৌবাচ্চার বাসী জল যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। কিন্তু তা-ই প্রয়োজন, বরফই প্রয়োজন উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করবার জন্য।

স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে, ঘরে আসতে, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা কেটে গেল। এতক্ষণে সকাল হয়েছে, পাখী ডেকেছে বাইরে, কিন্তু, কী আশ্চর্য, ঘুম দেখি তখনও ভাঙে নি অরুর। তবে কি সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে?

ভিজে কাপড় চোপড়গুলো একধারে রেখে, ওর খাটের দিকে এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। বালিশ থেকে মাথাটা নেমে গেছে, কেমন হাত পা গুটিয়ে কুঁকড়ে ছেলেমানুষের মতো শুয়ে আছে অরু। দেখতে দেখতে বড়ো মায়া জাগল। খুব সন্তর্পণে ওর বিছানার এক পাশে বসে পড়ে, ওর মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলোর ওপরে হাত রাখতে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো, আশ্চর্য সংযমী পুরুষ ও, ওর মানসিক শক্তির কি তুলনা আছে? এই একটি যায়গায় বোধ হয় তোমার কাছে আমার হার হল অরু, একটি যায়গায় হার হলো।

উঠলাম। দিলাম জানালা খুলে। কী চমৎকার ভোরের এই আলো। আকাশের প্রান্তে কে যেন অজস্র কুসুম ছুঁড়ে দিয়েছে, খুশী হওয়া লঘু মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে এ কী লাজারুণ আবেগ! কতোগুলি টিয়াপাখী ডাকতে ডাকতে চলে গেল এদিক থেকে ওদিকে। ওদের ঠোঁটগুলি যেন সিঁদুরের মতো লাল! কাছেই কোন্ একটা গাছে বসে কী এক পাখী অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠে ঝংকার তুলেছে! একটুক্ষণ থেমে-থেমে। ঐ আবার। শুনতে শুনতে মনে হলো, ওর সুরে সুর মিলিয়ে দিই আমার। গুণ গুণ করে উঠল মন। ফিরে অরুর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকালাম। তাকালাম আমার পরিত্যক্ত বিছানাটার দিকে। তাকিয়ে মনে পড়ে গেল কাল রাত্রের সেই অদ্ভুত উন্মাদনার কথাটা। ছিঃ-ছিঃ, সে কী

আমি? মায়ের মুখখানা আবার পড়ে গেল মনে। মার কথা ভাবতে-ভাবতেই ফিরলাম আবার জানালার দিকে। পাখীটা তখনো ডাকছে থেকে-থেকে। কী পাখী রে তুই? কতো ছোট পাখী?

কোন্ গাছের কোন্ ডালে সে বসে আছে, কে জানে!

কী-এক বিমল আনন্দে ধীরে ধীরে জেগে উঠল মন। যা হয়, খুশী হলে এক একদিন যেমন আমাকে পেয়ে বসে এক একটি গানের কলি, তেমনি পেয়ে বসল আমাকে একটি গান। তিলক কামোদ সুরে গুণ গুণ করে উঠলাম—

মাইয়া মোরী, ম্যায় নহী মাখন খায়ো।
ভোর ভয়ো, গৈয়নকে পাছে মধুবন মোহি পাঠায়ো॥

তারপর, ফিরে ফিরে গাইতে লাগলাম মাত্র এই কলিটি—ম্যায় নহী মাখন খায়ো।

যেন আমার অবচেতন মন কী এক আত্মদোষ স্খালন করতে চাইছে, নইলে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই পংক্তিটিই বা জেগে উঠছে কেন মনে?

ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালাম অরুর শিয়রে, ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডেকে উঠলাম—ওঠো? উঠবে না?

উঠে, আমাকে সদ্যোস্নাত মুক্ত-কুন্তলা দেখে বোধহয় একটু অবাকই হলো, কিন্তু কিছু বলল না, চলে গেল স্নানের ঘরে।

ফিরে এলে বললাম—অরু, শোনো?

কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর, কেমন যেন অপরাধী অপরাধী ওর ভাব। কাছে এসে নতমুখে বললে—কী?

বললাম—এখুনি রওনা হই, চলো।

সংক্ষেপে বললে—বেশ।

তারপরেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বিশেষ কিছু কথাবার্তা আর হয় নি, চা-পর্ব সেরে সত্যি সত্যি আমাকে নিয়ে উঠল মোটরে। বিছানাপত্র যা কিছু বাঁধাবাঁধি করবার দরকার, সব করে নিল রামখেলাওন। তারপর?

তারপর, গাড়ী চলেছে হু-হু করে, আর মন আমার গুঞ্জন তুলছে অবিরাম—ম্যায় নহী মাখন খায়ো। সাতনা ছাড়িয়ে গাড়ী যখন ডিংরীর দিকে, তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেছে। অরু সারাটা পথ চুপচাপই ছিল বলা যায়। আমিও যে বিশেষ কথা বলেছি এমন নয়। এবারে বললাম—অরু?

—কী?

ওর বিষণ্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে সত্যিই বড়ো কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সব কিছু সংগ্রামের এখানেই ইতি হয়ে যাক।

বললাম—কলকাতা যাওয়া দরকার, কিন্তু আমি যাবো না। পৌঁছেই তুমি একটা চিঠি লিখে দেবে আমার মাকে আর বাবাকে। ওঁরাই চলে আসুন। এখানেই হোক যা হবার, কলকাতা গিয়ে দরকার নেই বাপু।

ও একটু বিস্মিত হয়েই তাকালো আমার মুখের দিকে। বললাম—বুঝলে না? বিয়ে।

—কার?

—আমার। শ্রীমান অরিন্দমের সঙ্গে।

হেসে ফেললাম। ও আমার হাতটা ধরে, আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললে—ত্বরা কিসের?

বলে উঠলাম—ত্বরা! ওমা, এযে বেসুরো গাইছে!

—সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখের কোণে, বললে—বলেছি ত, অপেক্ষা করব অনন্তকাল!

বললাম—অনন্তকালের জন্য ত বাঁচব না।

তখনো চুপ করে আছে দেখে লঘুকণ্ঠে বলে উঠলাম—করবে ত, এখুনি বিয়ে করো, নইলে আরও বুড়ী হয়ে যাবো, তখন আর বিয়ে করতে ইচ্ছা করবে না।

ও কিন্তু তবু কোনো সাড়া দিলো না, একটু হেসে চুপ রইল শুধু। হাতখানা অবশ্য হাতেই আছে ধরা।

বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল সন্ধ্যা। জগদীশ এসে তাদের জিনিষপত্র সব নিয়ে চলে গেল, কিন্তু এলো না লতা। যাবো-যাবো করেও যাওয়া হলো না তার কাছে, পায়ে-পায়ে এলাম আমার ঘরে। শিউশরণ আর যমুনা, দুজনেই এলো ছুটে। যমুনা বললে—ভালো ছিলে দিদিমণি? কেমন দেখলে যায়গা?

অরু তার ঘর থেকে ফিরে এলো আমার ঘরের দিকে, বাইরে থেকে ডাকল—আসব?

—এসো।

এলো। বললে—চিঠি এসেছে। দুখানা চিঠি। বাড়ীর বোধ হয়। এই নাও।

হাতে চিঠি দুখানা নিয়ে কী যে আনন্দ হলো তা বলার নয়। একখানা মায়ের। লিখেছে—অরু ভালো আছে ত? তুই কবে আসবি? তোর শরীর মন দুই-ই ক্লান্ত আমি জানি, দুদিন বিশ্রাম নিয়ে আসিস। তোর চিঠি অবশ্য পেয়েছি। অরু ভালো আছে লিখেছিলি, তবু মায়ের মন ত, বারে বারে কেঁদে বলে—ভালো নেই। ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

আসল চিঠিটাই লিখেছে ক্ষমা। মায়ের মতো পোস্টকার্ডে নয়, খামে। খানিকটা ছিঁড়ে পড়তে শুরু করলাম। —বড়দি, এমন কখনো হয় নি। তুমি এতকাল বাইরে-বাইরে থেকেছ, মন কখনো কাঁদেনি। আজ কাঁদছে। কাঁদছে তোমারই জন্য। মনে হচ্ছে, আমার একটি সত্তা বুঝি নেই। বড়দি, তোমাকে যে আমি এত ভালবাসি, তা কি আমি কখনো আগে জানতুম? চুপি চুপি বলি, তোমার জন্য, তোমার কথা ভাবতে-ভাবতে সত্যিই চোখে জল এসে পড়ে। আরও পড়ে, যখন কানে আসে, তোমাকে নিয়ে বিশ্রী সব কথা। দাদা আর বৌদি তোমাকে বুঝতে বারবার এতো ভুল করে কেন, জানি না। এবং সে ভুলের রেশ আমার শ্বশুর বাড়ীতে এসেও কেমন করে যেন পৌঁছেছে। কিন্তু আমি বলি, এ ভুল ওদের কেন হবে? বড়দির নিষ্পাপ মনটাকে ওরা অনুভব করতে পারে না? বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে যে-কেউ বলে দিতে পারে, কতো পবিত্র সে—কতো নির্মল! ওরা জানে না, কিন্তু আমি জানি, বড়দি দেহের দিক থেকেও নিষ্কলুষ—বড়দি আজও কুমারী। বড়ো হয়েছি, বিবাহিতা আমি, তাই মেজদিকে কাল কথাটা বলেই ফেলেছি। বলেছি—বড়দি, যাকে বলে, আজও অচুম্বিতা।

থর থর করে এখানে আমার কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। চারদিকে কেউ নেই, ঘরে একা-একা বসে চিঠি পড়ছি। সামলে নিয়ে আবার শুরু করলাম পড়া, বাকী অংশটুকু। লিখেছে—মেজদির খুব অসুখ, তুমি যেদিন গেলে, তার পরদিনই ও এসে পড়েছে মীরাট থেকে। হাসপাতালেই দেবার কথা হয়েছিল, কিন্তু, বাবা বাড়ীতেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পেটে টিউমার না কী, অপারেশন করতে হবে।

অলকা! অলকার অসুখ!

শেষ করলাম ক্ষমার চিঠি, আর খবরের মধ্যে তেমন কিছু নেই, কিন্তু—

সারারাত ছটফট করে কাটালাম। চোখের পাতা ভিজে উঠল বারবার। প্রথমে মনে হয়েছিল, বিমল আর বিমলের বউয়ের কথা যা লিখেছে ক্ষমা, তাতে করে আর কখনো যাবো না ও'বাড়ী। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাকে যেতেই হবে, এখুনি যেতে হবে। অলকার আজ নিশ্চয়ই খুব দরকার আমাকে। কতদিন—কতদিন তোকে দেখি না অলকা! সেই যে আমি মীরাট যাবো না শুনে মুখ ভার করে কাটালি সারাদিন, একটা কথাও বললি না,—সেই দিনই ত শেষ দেখা। কিন্তু যদি তোর কিছু হয়, যদি তোকে আর কোনদিন না দেখতে পাই? আমি বাঁচব না রে অলকা, আমি বাঁচব না!

অরুকে সব কথা বললাম। পরদিন সকালে। বলতে-বলতে কেঁদেই ফেললাম ঝরঝর করে ওর সামনে। ও কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, বেশ ত, এখুনি যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বললাম—তুমিও সঙ্গে চলো। আমার হাত-পা কাঁপছে ঠকঠক করে। একা আমি পারব না—কিছুতেই পারব না যেতে।

ও আমাকে ধীরে ধীরে টেনে নিলো বুকের কাছে স্থিরচিত্ত অভিভাবকের মতো, বললে—কেঁদো না—কাঁদে না—ছি! বেশ ত, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই অরু সব গোছানোর পালা শেষ করে ফেলল। ওর কাজ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ওরও বিড়ম্বনা কম নয়। এই ঘুরে এলো খাজুরাহো থেকে, অমনি আবার চলো কলকাতা। টাকার খরচাও কম হলো না। আমার টাকা দিতে গেলাম ওকে মানিকপুর স্টেশনে গিয়ে, তা ও কিছুতেই নিলো না হাত পেতে। সওয়া আটটা আন্দাজ ছিল একটা ট্রেন, সেটা কোন ক্রমে ধরে আমরা যখন এলাহাবাদ পৌছলাম তখন প্রায় এগারটা বাজে। তারপরেই পাওয়া গেল দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেস; শুনলাম, সওয়া এগারোটাতেই এসে পড়বে। গাড়ী বদলে, সেটা ধরে হাওড়া পৌছলাম সকাল সাতটার পর। পথে যাতে আমার কোনো কষ্ট না হয়, তার জন্যে কতো যত্নই না করেছে অরু। একেবারে সত্যিই অভিভাবকের মতো। ফার্স্টক্লাশ বার্থ। কামরায় আরও লোক ছিল। আমার ঠিক ওপরের বার্থটিতে ওর যাবার কথা, কিন্তু গেল না, সারারাত ঠায় বসে রইল আমার শিয়রে, বললে ঘুমাও। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। লোকজন না থাকলে আমি বোধ হয় ওর হাতটা বুকের ওপর টেনে এনে সান্ত্বনা খুঁজতাম। মনটা হু-হু করে উঠছে সারাক্ষণ। অলকার জন্য মনটা যে আমার এতো কাঁদতে পারে, এ-ও আমার কাছে এক আবিষ্কার। অরু কতো চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই মুখে দেইনি টেনে। ইচ্ছা করে নি। মন বলছে—কতক্ষণে যাবো—কতক্ষণে গিয়ে পৌছবো? অলকার ছেলেটার নাম দিয়েছিলাম—সৌমক কুমার। তার মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে পড়ছে না কিছুতেই। কার মতো দেখতে হয়েছে তাকে? মায়ের মতো? না, বাপের মতো? না, জ্যেঠার মুখের কিছুটা আদল আসে?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, বুকের ভিতরে রক্ত চলাচল বুঝি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল! পৃথিবীর সব বাতাস বুঝি ফুরিয়ে গেল! সেই যে একবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, আর অরু করেছিল আমার শুশ্রূষা, ঠিক তেমনি বুঝি হয়ে আসছে আমার অবস্থা, কপালের ওপর রাখা ওর হাতখানা চেপে ধরলাম সজোরে।

ও একটু ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলো—কী হলো?

অস্ফুটকণ্ঠে বললাম—কিছু না।

—ঘুমোও।

কিন্তু, যতো রাত্রিই হোক, কে ঘুমাবে এখন? বিচ্ছিন্ন-শির বলির পশুর মতো যন্ত্রণায় ছটফট করছি অনুক্ষণ, আর নিজেই ভেবে-ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি,—এত ভালবাসা! এত ভালবাসা আমার ছিল অলকার ওপর? কিম্বা, অলকাকে জড়িয়ে অন্য কারুর স্মৃতি আমার অবচেতন মনে এসে এসে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে!

আমাদের সেই নতুন বাড়ি। গাড়ীর শব্দ শুনে, কে-কে এসে দাঁড়ালো খেয়াল নেই, অরু কাদের সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে, তা-ও মনে নেই। কোন্ ঘরে অলকা আছে, এটা ক্ষমাকে জিজ্ঞেস করে, ওপরে উঠতে গিয়েও মনে হলো, বাবা যদি নীচের ঘরে বৈঠকখানায় থেকে থাকেন ত, প্রণামটা একেবারে সেরে যাই। ভেবে, বৈঠকখানার চৌকাটে যেইমাত্র পা দিয়েছি, অমনি যেন মন্ত্রবলে আমি পাষাণ-মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেলাম। খাজুরাহোর সেই নৃত্যপরায়ণা নারী-মূর্তি হয়ে গেছি যেন আমি! সেই নৃত্যভঙ্গিতে ঊর্দ্ধলোকের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকা! সেই তার অনুচ্চারিত বাণী—দেহের যেখানে খুশী স্পর্শ করো লোভাতুরের দল, কোনো স্পন্দনই জাগবে না আমার অন্তরলোকে, যতক্ষণ না পাই তার দর্শন! তাকে ছোঁয়া নয়, তাকে দেখা মাত্রই জেগে উঠব আমি, হিল্লোল উঠবে আমার অঙ্গে অঙ্গে! দেহ-মন আত্মার অনুভূতি এক হয়ে গিয়ে যে প্রচণ্ড এবং মহত্তর অনুভূতির মধ্যে আমি জেগে উঠব, তার নাম—প্রেম। একটি নয়, দুটি নয়, একশো নয়, দুশো নয়, সহস্র বৎসর ধরে অপেক্ষা করে আছি!

বৈঠকখানায় কারা ছিলেন না। সারা ঘরখানায় এতগুলি চেয়ার সাজানো, কিন্তু বসে আছেন মাত্র একটি লোক, তিনি অলকার ভাশুর, হরিশবাবু।

একটা তীক্ষ্ণ ছুরিকা কে যেন হঠাৎ বসিয়ে দিলো আমার মুক্তিদের ব্রহ্মরন্ধ্রে, মনে হলো ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটেছে ওখান থেকে,—উচ্ছলিত উত্তপ্ত সে রক্তধারা! অথবা, রক্ত নয়, বুঝি জ্বলন্ত অগ্নিস্রোত! ক্ষমা কাছে নেই, অরুকে নিয়ে এগিয়ে গেছে সে। কাছে কেউ নেই। ঘরের সামনের দরজাটা যেন বেঁকে যেতে লাগল, কারা যেন কোথায় দাঁড়িয়ে একযোগে হাহাকার করে উঠল—কোন্ মন্দিরে আবার যেন ঘণ্টাও বাজছে, কে যেন কোথায় হাতে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে কোন্ দেবতার আরতি করছে প্রমত্ত অধীরতায়! ভেঙে পড়ছে কোথাকার কোন্ দেয়াল, অথচ, তিলক-কামোদে সানাইয়ের সুরও ধরেছে কে যেন সঙ্গে সঙ্গে।

দুখানি প্রসারিত হাত, একখানি উদ্বিগ্ন মুখ। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন প্রশ্নও করছে। কাছে—অতি কাছে সেই মুখ। পরক্ষণেই তা ঝাপসা হয়ে গেল—মিলিয়ে গেল,—প্রবল ঘণ্টাধ্বনি আর সানাইয়ের সুরের মধ্যে ডুবে গেল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। সানাই যেন আর্ত-ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে তখন ক্রমাগত বলে চলেছে—

'ম্যায় নহী মাখন খায়ো! ম্যায় নহী মাখন খায়ো!'

[ক্রমশঃ]

গ্রন্থ-প্রদর্শনী

সম্প্রতি লণ্ডনের ন্যাশনাল বুক লীগ সমসাময়িক বৃটিশ গ্রন্থাবলীর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রদর্শনীর একাংশে কিছু বিরলতম গ্রন্থের সমাবেশ করা হয়েছিল। সর্বসমেত প্রায় একহাজার গ্রন্থ এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রধানত ইংলণ্ডের রাজনীতিকদের সম্বন্ধে, ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ক, ইংলণ্ডের থিয়েটার, বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস এবং বৃটিশ জাতি বিষয়ক গ্রন্থই স্থান পেয়েছে।

রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে স্যার উইনস্টন চার্চিল সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থই সর্বাধিক। অবশ্য গ্ল্যাডস্টোন সম্বন্ধে তিনখানি এবং পিট সম্বন্ধে চারখানি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লর্ড রোজবেরি লিখিত উইলিয়ম পিটের জীবনী। এটি প্রায় সত্তর বছর পূর্বে মুদ্রিত হয়েছিল।

ইতিহাস এবং থিয়েটার বিষয়ক গ্রন্থসংখ্যাই সর্বাধিক। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও স্যার উইনস্টন চার্চিল প্রধান স্থান অধিকার করেছেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থমালার মধ্যে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং ইংলণ্ডের প্রাচীন প্রাসাদ সম্পর্কিত গ্রন্থদুটি উল্লেখযোগ্য।

থিয়েটার সংক্রান্ত গ্রন্থ দুই শতাধিক। একটি জাতির যথার্থ পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে—এই মতে আস্থাশীল বৃটিশজাতি, অভিনয় ও নাটমঞ্চ সংক্রান্ত গ্রন্থের প্রতি যে অত্যধিক আকৃষ্ট সেপরিচয় পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, অভিনয়কলার সমালোচনা, জীবিত অভিনেতৃবৃন্দের জীবনী ও অভিনয়কলার আলোচনা ইত্যাদি সংক্রান্ত অজস্র গ্রন্থ, সৌখিন অভিনয় মঞ্চসজ্জা, রূপ সজ্জা, প্রয়োগশিল্প সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থ।

বিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের গ্রন্থ প্রাধান্যলাভ করেছে, তাঁরা হচ্ছেন—Sir Compton Mackenzie, Somerset Maugham, Ronald Firbank, ও James Joyce. John Galsworthy র বই আছে কিন্তু Arnold Bennet অনুপস্থিত। H. G. Wells এর মাত্র দুখানি বই আছে—The History of Mr. Polly এবং The War of the Worlds. অবশ্য এ দুখানি বই তাঁর প্রতিভার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। George Birmingham এর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Spanish Gold বইটি এখানে রয়েছে।

এ ছাড়া ইংরেজ জাতির পরিচয়জ্ঞাপক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম—British Empirical Philosophers, Poets of the English language, Oxford Dictionary of Nursery Rhymes ইত্যাদি।

প্রদর্শনীটি খুব ব্যাপকভাবে আয়োজিত না হলেও এর থেকে আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্নমুখী ধারা ও ক্রমপ্রসারের একটি পরিচয় পাওয়া যাবে। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা কোন প্রবেশমূল্যের ব্যবস্থা ছিল না।

আমাদের দেশে ন্যাশনাল বুক লীগের মত কোন সাহিত্যপ্রেমিক সংস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। তবে এখানে সুরুচিসম্পন্ন একাধিক প্রকাশক আছেন, যাঁরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে প্রতিবছর এই ধরনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারেন। শিল্পপ্রদর্শনীর মত গ্রন্থপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রদর্শনী মারফৎ সাহিত্যপাঠকের আগ্রহ ও উৎসাহ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। অন্ততঃ বাঙলাদেশ গ্রন্থপ্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পৃথিকৃৎ হতে পারে।

বিদেশী শিল্পীর চোখে ভারত

কলকাতার আর্ট্রিয় হাউস, মিউজিয়াম এবং আরও বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই বিভিন্ন শিল্পী অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। খ্যাত শিল্পী ছাড়াও একাধিক শিক্ষানবিশ শিল্পী তাঁদের আঁকা ছবি জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরেন।

সম্প্রতি ভারতীয় যাদুঘরের দক্ষিণ কক্ষে যে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় সেটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী শিল্পীবৃন্দ ইতিপূর্বে যে ভারতীয় জীবনের চিত্র অঙ্কন করেন নি, তা নয়। কিছুকাল পূর্বে ভারতজাত রুশ শিল্পী রোয়েরিকের একটি চিত্র প্রদর্শনী সকলকে মুগ্ধ করে।

আলোচ্য চিত্র প্রদর্শনীটিতে কেবল মাত্র রুশ-শিল্পী অঙ্কিত ভারতীয় জীবন ও জাতি সম্পর্কীয় চিত্রই স্থান পেয়েছে। ভারতের নিসর্গশোভা চিরদিনই বিদেশীদের মুগ্ধ করেছে, আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ভারতের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও দরদ না থাকলে এ ধরনের ছবি আঁকা যায় না। তেলরঙ, জলরঙ, প্যাস্টেল ইত্যাদির সাহায্যে আঁকা পঁচিশজন শিল্পীর মোট ১৫৮ খানি চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। বাস্তব জীবন থেকে সৌন্দর্য আহরণের প্রচেষ্টাই এই চিত্রগুলিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি এখানে ঠাঁই পায় নি। কর্তৃপক্ষ আর একটি ব্যবস্থা করেছেন, এখানে কোন প্রবেশমূল্যের ব্যবস্থা নেই।

শিল্পীবৃন্দের অধিকাংশই ভারতে এসেছিলেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে। সেই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তাঁরা ভারতকে দেখেছেন গভীর সংবেদনশীল মন দিয়ে। তাঁদের এই দর্শন যে বিকৃত নয়, তার প্রমাণ এই চিত্রাবলী। তখন তাঁরা সাধারণ স্কেচ করে নিয়েছিলেন, পরে অবসর মত খড়মাটির ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে রঙিন করে জীবন্ত মূর্তি গড়েছেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডধূসর ছায়া, শ্যামল স্নিগ্ধ বনানী, উজ্জ্বল আকাশ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি—সবই এদের চোখে ধরা দিয়েছে।

ভাসিলি এফানক, পিটার স্মোলিন ও সেমেন চুইকফের ছবি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলকাতার রাজপথ, কলতলা, শ্রমিকের গান প্রভৃতি ছবিতে ভারতীয় জীবন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। আলেকজান্দ্রে হেরাসিমফ ইতিপূর্বে ভারতীয় জীবনের ছবি এঁকে খ্যাত হয়েছেন। এই অতিবৃদ্ধ শিল্পীর আঁকা ছবিও প্রদর্শনীটিতে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি ছবিতে রঙের উগ্রতা দৃষ্টিকটু লাগে। তবু সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে প্রদর্শনীটি সার্থক। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, ভারতীয় জীবনকে অন্তর দিয়ে ভালো না বাসলে এমন প্রাণময় ছবি আঁকা যায় না। অন্যান্য দেশের শিল্পীরাও যদি যথার্থ শিল্পীর মন দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখেন ও ভারত সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কণে আগ্রহী হন, তাহলে আমরা একাধিক সার্থক শিল্পীর চোখ দিয়ে ভারতকে নতুন করে দেখার সুযোগ পাব।

ভ্রাম্যমান-গ্রন্থাগার

সমগ্র ভারতে সম্প্রতি গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। স্বল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের মনে গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি করা এই আন্দোলনের কর্মসূচীর ছিল। পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য অংশ ছিল ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বিশেষ প্রসারিত হয় নি।

দিল্লীর পাবলিক লাইব্রেরী সপ্তাহে চারদিন করে একটি ভ্যান পাঠিয়ে দেন চতুর্দিকের গ্রামাঞ্চলে বই

সরবরাহের জন্যে। গ্রাম্য স্বল্প শিক্ষিত অধিবাসীরা যথেষ্ট উৎসাহিত হন, তাদের মধ্যে গ্রন্থপাঠের আগ্রহও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদের সাহায্যে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীর এই পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার এর অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। লাইব্রেরীর ডিরেকটর বলেছেন নতুন আর একটি ভ্যান এসে গেলে তাঁরা গ্রামাঞ্চলের আরও নব্বই হাজার লোকের পাঠ-তৃষ্ণা নিবারণ করতে সমর্থ হবেন। ১৯৫৩ সাল থেকে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারটি চালু হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা অনুসারে দিল্লীর এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

দিল্লী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যাতেও সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে এই কটি রাজ্যে ৪৭টি জিলা গ্রন্থাগার আছে। এ সব গ্রন্থাগারের অনেকগুলিই গ্রামে গ্রামে বই পৌছে দেবার ব্যবস্থা চালু করেছে। প্রত্যেকটি জিলা গ্রন্থাগারের অধীনে কতকগুলি করে ছোট গ্রন্থাগার থাকে, এবং পল্লী অঞ্চলের এই সব গ্রন্থাগারে মোটর ভ্যান বা সাইকেল করে বই পৌছে দেবার ব্যবস্থা আছে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি, পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম বাঙলায় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় নি। পশ্চিম বাঙলার গ্রামীন জনসাধারণের উপযুক্ত পাঠ্য বিষয় নির্বাচন সর্বপ্রথম প্রয়োজন। শুধু মাত্র নাটক-নভেল ছোট গল্পই গ্রন্থাগারের সম্পদ নয়। সহজ ভাষায় রচিত, বাঙলার প্রকৃতি, কৃষি, সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় রচনা, বাঙলার মহাপুরুষদের জীবনী ও কর্মাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থ যদি গ্রামাঞ্চলের পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তবেই তাঁরা যথার্থ উপকৃত হবেন, এবং এইভাবে তাঁদের পাঠতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হবে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের সাহায্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারলেই গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠবে।

স্বল্পমূল্যে গ্রন্থবিক্রয়

প্রচ্ছদপটের মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে। কাগজের অত্যধিক মূল্য, বহুবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট ইত্যাদির জন্যে ইদানিং বইয়ের দামও ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বই, আমাদের সৌভাগ্য, এখনো প্রচ্ছদপট-নির্ভর নয়। মলাটই ললাট, আধুনিক গ্রন্থব্যবসায়ীদের বিজনেস সিক্রেট। আমাদের সংস্কৃতি ও রুচির মান কত নেমে যাচ্ছে ভাবলে বিস্মিত হই। বেশ কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব করছেন একাধিক সুধীব্যক্তি কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্ণপাত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না। অধুনা ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহের দিকে গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তিরা বিশেষ নজর দিতে পারছেন না। সংসারে আর দশটি প্রয়োজন মিটিয়ে বই কেনার বাতিককে বিলাসরূপেই ভেবে নিচ্ছেন মধ্যবিত্ত সমাজ। এ জন্যেই ক্রমশঃ ব্যক্তিগত গ্রন্থক্রয়ও ক্রমে আসছে।

গুনে পেপারব্যাক এডিশনের বইয়ের বিরাট প্রদর্শনী হয়ে গেল। সস্তায় বই বিক্রি করে পৃথিবীর বইয়ের বাজার ধরে রাখবার জন্যে বৃটিশ প্রকাশক ও সরকারের গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেল। বৃটিশ প্রকাশক স্যার এলেন লেন পেপারব্যাকের প্রচলন করেন। আজ পেঙ্গুইন সিরিজ জগদ্বিখ্যাত। পঁচিশ বছর আগে এই সিরিজ সর্বপ্রথম তিনিই প্রচলন করেন। আজ আমেরিকা, রাশিয়া নানা সিরিজ প্রকাশ করে

পৃথিবীর বইয়ের বাজারে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করছে। যে কত সস্তায় বই বিক্রি করতে পারছে তার বাজার তত বাড়ছে। পেঙ্গুইন সিরিজের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী। রাশিয়াও প্রকাশকরা পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেছে কে কত কমদামে বাজারে বই ছাড়তে পারবে। প্রকাশকরা আশা করছে যে ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষে তারা এককোটি পেপারব্যাক বিক্রি করবে। এতে পেঙ্গুইন সিরিজের বিক্রি কমবে। এ জন্যে বৃটিশ সরকার সচেষ্ট হয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। তাঁরা পেপারব্যাকের দাম কমিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা? পৃথিবীজোড়া বাজার আমাদের নেই, সে আমাদের ভাষার দুর্ভাগ্য। তবু যে বাজার আমাদের আছে, বিশেষ গ্রন্থপাঠের যে রুচি আমাদের শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত মহলে আছে, তাকে যদি বাড়িয়ে তুলতে চাই বা বাঁচিয়ে রাখতে চাই তাহলে অনতিবিলম্বে বিভিন্ন প্রকাশকের সক্রিয় হওয়া উচিৎ। বর্তমানে ভারতের প্রতিবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় গ্রন্থের চাহিদা বাড়ছে। কিছু গ্রন্থ-রপ্তানির সংবাদও আমরা জেনেছি। আমাদের সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি দেন তাহলে বিশেষ সুবিধে হয়। ভারতীয় গ্রন্থের ব্যাপক অনুবাদ-সর্বপ্রথম প্রয়োজন। প্রথমতঃ শুধু মাত্র ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা চলতে পারে। সাধারণ কাগজে অনাড়ম্বর ছাপা ও বাঁধাইয়ে যদি বই তৈরী হয় তাহলে কম খরচে বই হবে, অল্পমূল্যে বিক্রি করা যাবে, বিক্রয় সংখ্যা বাড়বে—প্রকাশককেও লোকশানের ঝুঁকি নিতে হয় না। পাশাপাশি শোভন সংস্করণও হতে পারে। পাঠক ও লেখক উভয়েই উপকৃত হবে।

বরিস পাস্তেরনাক

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব অল্পদিনের ব্যবধানে পরপর দুজন সাহিত্যিক লোকান্তরিত হলেন। আলবেয়ার কাম্যু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কারের জন্যেই তাঁর খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী নয়। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের নবপথিকৃৎ রূপে তিনি খ্যাত। বৃদ্ধ বয়সে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি বরিস পাস্তেরনাকও পরলোক গমন করেছেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পরই ইনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিতে যে আলোড়ন, বাদানুবাদ হয়েছে সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

'ডক্টর জিভাগো'র জন্যে পাস্তেরনাক নোবেল পুরস্কার পেলেন। এই গ্রন্থের জন্যে স্বদেশে যথেষ্ট ধিক্কৃত হয়েও ইঙ্গমার্কিন সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। পাস্তেরনাকের নায়ক সবল পুরুষ নন, উপরন্তু রোমান্টিক মনোদর্শী, নিঃসঙ্গমনা আইডিয়ালিস্ট, ঈশ্বরবিশ্বাসী, মার্কসবাদে আস্থাশীল নন। এই উপন্যাসে প্রাক্‌বিপ্লব রুশজীবন, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বাঁধাধরা জীবন, জনগণের আশ্রাভঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটি অহেতুক দীর্ঘ, সুখপাঠ্যও নয়। একজন সোভিয়েট লেখক বিপ্লবোত্তর রুশজীবনকে স্বীকার করেননি, বন্দনা করেন নি, উপরন্তু ব্যর্থতাই কীর্তন করেছেন—এখানেই পাস্তেরনাকের দুঃসাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাই। পুরস্কৃত হলেন তিনি কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার তীব্র বিরোধিতার জন্যে নোবেল প্রাইজ গ্রহণে অসম্মত হলেন। এমন কি রাশিয়ার কোন ভাষায় গ্রন্থটি মুদ্রিতও হয়নি। ইটালীয় ভাষায় গ্রন্থটি প্রথমে মুদ্রিত হয়।

পাস্তেরনাক সুকবি, সার্থক গল্প রচয়িতা, সফল অনুবাদক হিসেবে স্বীকৃত। মনে হয় কবিতার ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রাখতে পেরেছেন। যদিও খুব উচ্চস্তরের শিল্পী তিনি নন, তবু

একেবারে অগ্রাহ্যও তাঁকে করা যায় না। যদি কখনো তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেন, সে শুধু তাঁর কবিতার জন্যেই পারবেন।

পাস্তেরনাকের পিতা ছিলেন চিত্রশিল্পী, মাতা পিয়ানোবাদিকা। এই শিক্ষা ও সুরের পরিবেশে তাঁর শৈশব কাটে। মস্কো ও মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও দর্শনে উচ্চশিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন তিনি। প্রথমাবধি তাঁর মন রোমান্টিক। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কিউবো-ফিউচারিস্টদের দলে যোগ দেন। যদিও যোগাযোগ অন্তরঙ্গ ছিল না। কিউবো-ফিউচারিস্টদের বিশেষত্ব হচ্ছে দুর্বোধ্যশব্দ, অগ্রিয় ও অশালীন চিত্রকল্প প্রয়োগে। তাদের দর্শনে পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও তাদের আঙ্গিকের এই দিকটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

পাস্তেরনাকের প্রথম রচনা A twin in the cloud. ১৯২২-এ প্রকাশিত My sister, Life তাঁকে রাশিয়ার তরুণতম কবিদের অগ্রণী হিসেবে খ্যাত করে। ১৯২৬ এ প্রকাশিত হয় Spektorski. এই কাব্যগ্রন্থে কবির ব্যক্তিগতজীবন প্রতিফলিত। রাশিয়ার বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯২৭-এ রচনা করেন Lieutenant Schmidt. এটি গীতিকবিতাধর্মী রচনা। পাস্তেরনাকের অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্তিমানস প্রতিফলিত। সেজন্যে গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। ১৯৩২-এ তাঁর Second Birth প্রকাশিত হয়।

যদিও তাঁর কবিতা প্রায়শঃ জটিল ও দুর্বোধ্য, তবু পাস্তেরনাক সোভিয়েৎ বুদ্ধিজীবীদের কাছে জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্যসৃষ্টির দুর্বোধ্যতা, আত্মখাতন্ত্রাবোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি, ও আত্মমগ্নতা সোভিয়েৎ সমালোচকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। আঙ্গিকপ্রিয়তা ও জনসাধারণ থেকে দূরে সরে থাকবার চেষ্টার জন্যে তাঁকে সমালোচকবৃন্দের আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এজন্যে কিছুদিন তিনি অনুবাদের দিকে ঝোঁক দিলেন। সেকস্‌পীয়র, দান্তে, গ্যয়টে, রবীন্দ্রনাথ ও শেলীর কাব্য অনুবাদ করলেন। শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। On the early trains এবং The Terrestrial Expanse বই দুটি অপেক্ষাকৃত সরল ও পূর্বরচনার চেয়ে স্পষ্টতর।

পাস্তেরনাক প্রচণ্ড ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবি। দার্শনিক চিন্তা ও বাস্তবজীবনের দূরবগাহতা ছিল এঁর প্রিয় বিষয়বস্তু। সঙ্গে যুক্ত আছে প্রেম ও প্রকৃতিপ্রিয়তা। প্রকৃতিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিস্ময়কর ভাবে দেখতেন। প্রকৃতি যেন তাঁর কাছে জীবিত, জান্তব অস্তিত্বে উপস্থাপিত হত। তিনি আদিম মানবের বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতেন। কিন্তু এই দৃষ্টি অনেকটা যান্ত্রিক। বিংশশতাব্দীর কোন শিক্ষিত যন্ত্রসভ্যতায় লালিত পালিত ব্যক্তির কাছে আদিমদৃষ্টি আসতেই পারে না। তাঁর এই আদিমদৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত এবং অমৌলিক ভঙ্গিমাত্র। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না যান্ত্রিক গদ্যময়, অশালীন চিত্রকল্প ব্যবহারে। এটুকুই কিউবো-ফিউচারিস্টদের বিশেষত্ব। কোন প্রেমিকের অপরাধের সঙ্গে তিনি 'সংক্রামক চর্মরোগের' তুলনা দিয়েছেন। বাতাসের স্পর্শ ও সুরের তুলনা করেছেন হাসপাতালের দূষিত সাবানের ফেনার সঙ্গে। শব্দের চিত্ররূপ তাঁর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। Clatter of winter, Rumble of grief—শীত এবং দুঃখকে শব্দ দিয়ে উপলব্ধি।

পাস্তেরনাকের গদ্য তাঁর কবিতারই প্রলম্বিতরূপ। জ্ঞানও ঝঙ্কার ও দুরূহ চিত্রকল্প। ১৯২৫-এ প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় Childhood of Luvers. গল্পে কোন প্লট নেই, শুধুমাত্র অতীত স্মৃতিচিন্তার

সমাবেশ। একটি যুবতী নারীর পারিপার্শ্বিক জগৎসম্পর্কে মানস প্রতিক্রিয়া। অন্য গল্পটির নাম Airways ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পটভূমিকায় লেখা। রচনা বিচ্ছিন্ন, আবেগহীন—দৃঢ়পিনদ্ধ নয়, ধারাবাহিক কাহিনীর গতিবেগ নেই। বিপ্লববিরোধী চক্রান্তে যুক্ত তার অবৈধ সন্তানের রক্ষায় অসমর্থ পিতার কাহিনী। অপর গদ্যরচনা Safe Conduct-এ কবির যৌবন এবং প্রাথমিক আত্মোন্মেষের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয় গদ্যগ্রন্থ ডক্টর জিভাগো।

আধুনিককালের কয়েকজন বিখ্যাত কবির সঙ্গে সমালোচকবৃন্দ পাস্তেরনাকের তুলনা করে থাকেন; এঁরা হলেন এলিয়ট, হপকিনস ও রিল্‌কে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কয়েকজন সোভিয়েৎ কবির ওপর পাস্তেরনাকের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সে প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে সোভিয়েৎ সমালোচকদের বিরুদ্ধে সমালোচনায়।

রাশিয়ার বাইরের কিছু কিছু সমালোচকের মতে মায়াকভস্কি, ব্লক ও এশেনিনের মৃত্যুর পর পাস্তেরনাকই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও তিনি জীবনবিমুখ ও নির্জনতার কবিরূপে চিহ্নিত।

জীবনে যখন কর্মের স্থান সবার চেয়ে উপরে, পাস্তেরনাক তখন বিশুদ্ধ চিন্তা, বস্তুর সারোপলব্ধিতে ব্যস্ত। তাঁর চারিদিকে সকলে দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যস্ত, সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির চিন্তায় মগ্ন—তখন তিনি মগ্ন হয়ে আছেন সমুদ্র অরণ্য পর্বতের নিসর্গরাজ্যে।

সিম্‌বলিস্ট-ফিউচারিস্ট যুগের কবিদের শেষ প্রতিনিধি রূপে পাস্তেরনাককে আখ্যাত করা যায়। এলিয়ট, অডেন, এলুয়ারের যে যুগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, সেই যুগের ভাবধারাকে পাস্তেরনাক শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর শেষের দিকের কবিতায় জটিলতা কমে এসেছিল।

ডঃ জিভাগো পুস্তকের কাব্যাংশের জন্যই পাস্তেরনাককে পুরস্কৃত করা হয়েছিল, সেজন্যে প্রধানতঃ তাঁর কবিধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা হল।

মণিভদ্র

সম্পাদকীয়

শীর্ষ সম্মেলন :

১লা মে রাশিয়ার উপর উড্ডীয়মান অবস্থায় আমেরিকান বৈমানিক পাওয়ার্সকে অবতরণে বাধ্য করা হয় এবং গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কোন রাষ্ট্রের উপর বিদেশী বিমানের পরিক্রমা নিঃসন্দেহে তাহার সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং এই ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি সর্বথা নিন্দনীয়। তথাপি ইহাও অবশ্যস্বীকার্য যে প্রাচীনতম রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি হইতে অধুনাতন শাসনপদ্ধতি পর্যন্ত সকলেই এই আদিম বৃত্তিটির উপযোগিতা মানিয়া চলেন। তফাৎ এই যে গুপ্তচরদের 'গুপ্ত'ভাবেই কাজ করিতে হয়, 'প্রকাশ্যে' আসিলেই তাঁহারা তথাকথিত সভ্যতাভিমানী সমাজের কাছে ঘৃণ্য জীবরূপে পরিগণিত হন। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহার নিজের স্বার্থে গুপ্তচর নিয়োগ করে, মাঝে মাঝে তাহারা ধরাও পড়ে; যে রাষ্ট্রে ধরা পড়ে সে-রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী তাহাদের বিচার হয় এবং শাস্তিলাভ করে। কিন্তু বৈমানিক পাওয়ার্সকে উপলক্ষ করিয়া রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা ক্রুশ্চেভ যে নাটুকেপনা দেখাইলেন তাহা যেমনি অসংযত তেমনি কদর্য।

শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য মস্কো হইতে প্যারিস পর্যন্ত আসিয়া সম্মেলন আরম্ভের প্রাক্কালে ক্রুশ্চেভ একটি বিবৃতি পাঠ করেন। সে বিবৃতিতে তিনি বলেন যে—শীর্ষ সম্মেলনে তিনি যোগদান করিতে পারেন কয়েকটি সর্তে, এবং সে সব সর্ত হইতেছে—

(১) সোভিয়েটের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির জন্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রকে দুঃখপ্রকাশ করিতে হইবে, (২) ভবিষ্যতে মার্কিন বিমান রাশিয়ার সীমানা অতিক্রম করিবে না, এবং (৩) গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তিদান করিতে হইবে। এই সর্তপূরণে সম্মত না হইলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে একসঙ্গে সম্মেলনে বসিতে ক্রুশ্চেভ অসম্মত শুধু নহেন, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রাশিয়া সফরের আমন্ত্রণ অবধি তিনি প্রত্যাহার করিয়া লন। শিষ্টাচার, শালীনতা প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের নিকট আমরা আশা করি না, (প্রসঙ্গতঃ, আমন্ত্রিত অতিথিরূপে ভারতের বুকে দাঁড়াইয়া ভারতেরই অন্যতম মিত্র আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের অশালীন স্মৃতি অনেকেরই মনে পড়িবে) কিন্তু তাহারও একটা সাধারণ মাত্রাবোধ থাকা উচিত।

রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন, সেই সব প্রতিশ্রুতির কি সত্যই কোন মূল্য আছে? স্ব স্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রকেই যখন গুপ্তচর বাহিনী পোষণ করিতে হয় (রাশিয়াও তাহার ব্যতিক্রম নহে) তখন এই শিশুসুলভ ঠোঁট-ফোলানোর কি অর্থ হয় তাহা বোঝা শক্ত। শীর্ষসম্মেলন পণ্ড করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে মস্কোতে বসিয়াই ত তাহা করা যাইত, —অবশ্য নাটকটা এত জমিত না। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁহাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য প্রচারিত হয়, তাহা হইতে জানা গিয়াছিল যে স্ট্যালিন নাকি এক নাচের আসরে ক্রুশ্চেভকে নাচিতে আদেশ করেন এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নাচিতে হয়। আজ স্ট্যালিন জীবিত নাই, তথাপি নাচের অভ্যাস যে ক্রুশ্চেভ ভুলিতে পারেন নাই, শীর্ষ সম্মেলনেই তাহা প্রমাণিত হইল।

পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষ আজ অন্তরে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। 'যুদ্ধবাদী' এবং 'শান্তিবাদী'—উভয়পক্ষই মুখোসের আড়ালে যে পাঁয়তারা কষিতেছেন তাহার পরিণাম ভূগিতে হইবে সাধারণ মানুষকে—অর্থে সামর্থ্যে তো বটেই সর্বোপরি মানবশক্তির শোচনীয় অপচয়ে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমরাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে এবং রাষ্ট্রনায়করা নিখুঁতভাবে দৈত্যপতির ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন। বিজ্ঞানের উপাসক বৈজ্ঞানিকরা যতদিন না সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের দাসত্ব করিতে বা স্বীয় গবেষণার ফলাফল রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে অস্বীকার করিবেন ততদিন এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নহে। শীর্ষ-সম্মেলনই বলুন আর শান্তি-অভিযানই বলুন,—ভাঁওতার দ্বারা এই অবস্থার প্রতিরোধ সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না।

দক্ষিণ আফ্রিকা :

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবহনমন্ত্রী শ্রীশোম্যান এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তথাকার জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে যে বয়কট আন্দোলন সুরু হইয়াছে, উহা যদি আরও জোরদার হইয়া উঠে, তবে অনশনে মরিতে হইবে তিনি আরও বলেন, 'গত ৫০ বছরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন কদাপি এরূপ কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে নাই। সারা পৃথিবীতে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হইতেছে, যত রকমে সম্ভবপর, আমাদিগকে হয়রানি করা হইতেছে। পৃথিবীতে আজ আমরা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। একাকীও পৃথিবীর প্রায় প্রতেকটি দেশেই আমাদের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই আমরা উহার ফলাফল কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।'

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বিলম্বে হইলেও নিজেদের কৃতকর্মের ফলাফল যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাই শুভ-লক্ষণ। শ্বেতচর্মের অহমিকায় অশ্বেতকায়দের সঙ্গে যে অমানুষিক ব্যবহার তাঁহারা করিতেছেন, সভ্যনামধারী যে কোন জাতি বা মানুষ তাহাতে লজ্জিত বোধ করিতেছে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীব্যাপী উত্থিত সে-ধিক্কার তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। বাধ্য হইয়াই তাই বয়কট আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে—এবং তাহার ফলাফলও ইতিমধ্যেই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন।

বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাষা বোঝে, বিভিন্ন রোগেরও বিভিন্ন ঔষধ আছে। মনে হয় পৃথিবীর মানব-প্রেমিক জাতিসমূহ এতদিনে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদের রোগের উপযোগী ঔষধ নির্ণয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

আচার্য ভাবের শান্তি-অভিযান :

আচার্য ভাবে ও চম্বল-উপত্যকার দস্যুদলকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। শুনিয়াছি মার্শাল টিটো নাকি ভারত ভ্রমণে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে বিনারক্তপাতে কি করিয়া ভারতের ছয় শতাধিক দেশীয় রাজ্য ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার সূত্রটি জানাই তাঁহার ভারতভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য। আজ আচার্য ভাবের শান্তি অভিযান এই সমস্ত রাজ্যের ভারতভুক্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছে।

লুণ্ঠন ও হত্যা যাহাদের স্বভাবধর্ম বলিয়া জানা গিয়াছিল, সরকারী শাসনকেন্দ্র প্রচুর অর্থব্যয় ও লোক-ক্ষয়দ্বারাও যে অরাজকতা বন্ধ করিতে সক্ষম হন নাই, আচার্য ভাবের আহ্বানে সে-সমস্ত দস্যুদল আত্মসমর্পণ

করিয়াছে এবং আদালতে স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই আত্মসমর্পণের আহ্বানের সূচনায় আচার্য্য ভাবে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে আত্মসমর্পণের অর্থ শাস্তি হইতে অব্যাহতি নহে; বরং আত্ম-সমর্পণকারীদের তিনি পুলিশের হাতে তুলিয়া দিবেন, এবং দেশের আইন অনুযায়ী তাহাদের বিচার হইবে।

সব জানা সত্ত্বেও দস্যুদল আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ঘটনাচক্রের আবর্তনে সমাজচ্যুত হইয়া অস্বাভাবিক জীবন যাপনে যাহারা বাধ্য হইয়াছিল, সমাজের প্রতিভূস্বরূপ আচার্যজীর আহ্বানে তাহারা সমাজজীবনের শৃঙ্খলা মানিতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আইন তাহার কাজ করিবে। ইহাদের মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি আচার্যজী দেন নাই—তাহারাও নিশ্চয় তাহা আশা করে না। তবু, মানবতার নামে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিচার ব্যবস্থা আমরা প্রার্থনা করি। পাপের পথে নামিয়া যাইতে বাধা নাই—কিন্তু কেহ যদি সে-পথ ত্যাগ করিয়া সুস্থ সমাজজীবনে ফিরিয়া আসিতে চায়, সমস্ত সমাজের কর্তব্য আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরা। দেশ ও সমাজ সে কর্তব্য করিতেছে ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

আচার্য ভাবে মানুষের হৃদয়পরিবর্তনের যে উদ্দেশ্য লইয়া পদযাত্রা করিতেছেন, দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা জয়যুক্ত হউক—বিংশশতাব্দীর সমস্যাসঙ্কুল মানবসমাজ আজ এই প্রার্থনাই করিবে।

ছাত্র-আন্দোলনের ধারা:

পাটনা কমার্স কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য চারিজন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করা হয়। উহাদের মধ্যে একজন কলেজ হইতে কিছু দূরে একটি চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে। সনাক্ত করার জন্য ঐ মৃতদেহটিকে কলেজে আনা হয়। ঐ সময় কলেজ ভবনের নিকট প্রায় চারিশত ছাত্র জমিয়া গিয়াছিল—যাহারা কলেজে প্রবেশ করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও চারিজন অধ্যাপককে মারপিট করে। [আনন্দবাজার—১২ই মে]

স্কুল ফাইন্যালে মিথ্যা পরিচয় দিয়া পরীক্ষাদানের অভিযোগে গ্রাজুয়েট ও আইনের ছাত্র বরুণচন্দ্র দাস ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে এবং প্রকৃত পরীক্ষার্থী কিঙ্করমোহন দাঁ তাহাকে প্ররোচিত করার জন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। [আনন্দবাজার—১৮ই মে]

৫ই জ্যৈষ্ঠ এই বৎসরের বি-কম পরীক্ষার 'বানিজ্যিক আইন' সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণ কালে মধ্য কলকাতার কয়েকটি কেন্দ্রে কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিক্ষোভের ভাব দেখা যায়—যদিও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষার্থীরা কণ্ট্রোলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি এই সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ পেশ করার নির্দেশ দেন। [আনন্দবাজার—২০শে মে]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনের যে স্টং রুমে প্রশ্নপত্রাদি রক্ষিত হয় উহার বিভিন্ন দ্বারের সম্মুখে কড়া পাহারা মোতায়েন করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র খোয়া যাওয়া এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে গণ্ডগোলের যে হাওয়া উঠিয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। [আনন্দবাজার—২০শে মে]

এডভান্সড্ একাউন্টেন্সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন ও দীর্ঘ হইয়াছে এইরূপে অভিযোগ করিয়া ১২ জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে একদল বি-কম পরীক্ষার্থী দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অল্পসময় ইহা হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। ঐ সময় ফুলদানী ও টব উপর হইতে নীচে ছুঁড়িয়া ফেলা হয়, কাঁচের শার্সী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং টেলিফোন লাইন কাটিয়া দেওয়া হয়। [২৭ শে মে]

বি-কম পরীক্ষার শেষদিন ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পরীক্ষা গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে বেলা ১১টা হইতে পরীক্ষায় বসিতে অনিচ্ছুক এক শ্রেণীর ছাত্র আশুতোষ ভবনে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন কক্ষের টেবিল চেয়ার উল্টাইয়া দেয় এবং হল ও কক্ষগুলির সম্মুখে জমায়েত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। আরও কিছু পরে ১২টার সময় পরীক্ষা শুরু হইবার নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক আগে কিছু ঐ শ্রেণীর পরীক্ষার্থী হলের ভিতরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজায় খিল দিয়া দেয়। বিভিন্ন প্রবেশপথে বাধা সৃষ্টি করা হয়। ফলে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা ভিতরে ঢুকিতে বাধা পান। পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক এবং অনিচ্ছুক দুই শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ চেঁচামেচি চলিতে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলে বলিয়াও জানা গিয়াছে। গার্ড ও ইনভিজিলেটরগণ একরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বাহিরে প্রহরারত যে সকল পুলিশ কর্মচারী ছিলেন, উপাচার্য তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠান এবং ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করার অনুরোধ জানান। সোয়া বারটা নাগাদ মধ্য কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পুলিশ বাহিনী লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরীক্ষাকেন্দ্রের চারিপার্শ্বে ও বারান্দায় বেষ্টনী রচনা করেন। হলের ভিতর জমায়েত ছাত্রদের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সাড়ে বারটা নাগাদ অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে এবং পরীক্ষাদানে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা পুলিশের সাহায্য লইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পৌনে একটা নাগাদ ঐ কেন্দ্রে যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয়। তবে যে কোন কারণেই হউক, ঐ কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে বসেন নাই। [২৮শে মে]

উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে বাংলাদেশে ছাত্র-আন্দোলন আজ যে ধারায় প্রবাহিত তাহার মোটামুটি একটি চিত্র পাওয়া যাইবে। একটা ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি সমগ্র আবহাওয়াকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে ইহা হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইয়াছে। ছাত্রসমাজ যথেচ্ছাচার করিবে, তাহার জন্যে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিবে না! করিলেই শিক্ষকসমাজ প্রহৃত হইবেন। সমস্ত বৎসর পড়াশুনা না করিয়া পরীক্ষার হলে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা গ্রেস মার্কের ব্যবস্থা করার যে অপচেষ্টা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার জন্য শুধু ছাত্রসমাজই দায়ী নহে, দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষও—যাঁহারা যে কোন হামলার মুখে নতি স্বীকার করিয়া জনপ্রিয় হইবার বাসনায় প্রলুব্ধ। শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ত নির্লজ্জের মত ছাত্রদাবী মানা শুধু নহে ছাত্রদের অন্যায় আন্দোলনে সহযোগিতাই করিয়া চলিয়াছেন। অভিভাবকদের কথা তুলিয়া লাভ নাই—কারণ যে কোন প্রকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব শেষ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন তা সে পরীক্ষা সন্তানই দিক বা তাহার বদলে অন্য কেহ দিক। অথচ এই ব্যাপক ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মূলতঃ দায়ী অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে শিক্ষক সমাজ আপনাদের মর্যাদা, অধিকার ও প্রাপ্য অর্থ সম্বন্ধে যে পরিমাণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহা হন নাই। তদুপরি শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন

অপেক্ষা রাজনৈতিক খ্যাতি অর্জনের লোভ তাঁহাদের পাইয়া বসিয়াছে। ফলে দাবার চালের ঘুঁটির মত ছাত্রসমাজ তাঁহাদের খেয়াল খুশি মত রাজনীতির স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে। আমরা পূর্বেও-বহুবার বলিয়াছি, আবারও বলি—ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করিতে হইলে প্রথমত আইনের সাহায্যে শিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত অভিভাবকদের সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করিতে হইবে। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় সোভিয়েট সরকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকহারে বর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের উদ্দেশ্যে অভিভাবকদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া জানাইয়াছেন যে ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রের নির্দেশিত শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করিলে অভিভাবকদের তজ্জন্য দণ্ডিত হইতে হইবে।

দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ব্যাপকহারে অমনোযোগিতা, ফেলের হার ও পরিণামে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহার প্রতিরোধে সোভিয়েট সরকার কর্তৃক অবলম্বিত এই ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন আমরা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

অবশ্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রকেও আগাইয়া আসিতে হইবে নতুনতর প্রেরণা লইয়া। ছাত্রসমাজকে নাগরিক-বোধে উজ্জীবিত করা, দেশ ও সমাজের সেবায় অনুপ্রাণিত করা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলাবোধ প্রবর্তন করার দায়িত্ব সরকারের।

ছাত্রদের জন্য সেবামূলক কাজের এক পরিকল্পনা রচনা করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে ডঃ সি, ডি, দেশমুখের নেতৃত্বে জাতীয় সেবা কমিটি গঠন করেন। সম্প্রতি সেই কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, জাতির সেবামূলক কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে এবং দেশের প্রয়োজনীয় জনবলের গুণাবলীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যে কোন জাতীয় সেবামূলক পরিকল্পনাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। কমিটির মতে, প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃপক্ষে নয় মাস হইতে এক বৎসর কাল কোন সেবামূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কিংবা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করিয়া ছাত্রগণ যখন জীবনের কর্মক্ষেত্রে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহা-দিগকে জাতির সেবায় নিয়োগের উপযুক্ত সময়। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় যে অভাব থাকিয়া যায়, এই সময়ে ছাত্রগণ জাতির সেবা করিলে তাহা পূরণ হইবে। জাতির সেবামূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কমিটি একটি ব্যাপক ও নিরপেক্ষ জাতীয় বোর্ড গঠনেরও সুপারিশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি পুণার নিকটে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও জাতীয় সেবা কমিটির এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ভারত সরকার যত সত্বর এই সুপারিশ গ্রহণ করিবেন তত বেশী সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন।

সরকার যদি আইনের সাহায্যে অভিভাবকদের বাধ্য করিতে পারেন সন্তান সম্বন্ধে আরও অবহিত হইতে, শিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিতে এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে সমাজ তথা জাতি ও দেশের সেবামূলক কাজের পরিকল্পনা দ্বারা নতুনতর প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারেন তবেই মাত্র এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব অন্যথা ছাত্র তথা যুব সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে দিবারাত্রি আর্তনাদ করিয়া কোন ফল আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

সম্পাদিকা ঃ মালবিকা দত্ত

মালবিকা দত্ত কর্তৃক ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৮৮বি, মদনমোহন বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা-. হইতে মুদ্রিত এবং তরুণের স্বপ্ন কার্যালয় ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।